অন্য নগর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দিগন্ত পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৫৯

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক
অজিত দত্ত
দিগন্ত পাবলিশার্স
২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

রচনাকাল

১৩ই মে (শুক্রবার সকাল)

থেকে

২রা জুন (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা)

লণ্ডন : ১৯৪৯

উৎসর্গ

শ্রীমতী গৌরী মুখোপাধ্যায়

শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

যে দু'জন

'অন্য নগর'

প্রথম

শুনেছিলেন।

অন্য নগর

১

পিকাডিলি থেকে লেস্টার স্কোয়ার মিনিট পাঁচ-সাতের পথ। লোকে সাধারণত টিউব নেয় না, বাসেও চড়ে না, ওটুকু পথ হেঁটেই চলে যায়।

আরও নানা আকর্ষণ এখানে জন সাধারণের কৌতূহল জাগায়। এ অংশটুকু হ'লো লণ্ডনের হৃৎপিণ্ড। তাই সব সময় এখানে হাজার বিদেশীর ভিড। ইংল্যাণ্ডের নানা স্থান থেকে যারা আসে এখানে দাঁড়িয়ে তাদের মাথা ঘুরে যায়। অ্যামেরিকান ট্যুরিস্টরা হাঁ করে ইরসের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। ফরাসী কিংবা ভারতীয় অথবা কন্টিনেন্টের অন্যান্য আগন্তুক এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকে।

কিন্তু ওই একবারই। বড়লোক না হ'লে দ্বিতীয়বার এ পাড়ার রেস্তোরাঁয় আর কেউ যায় না। দাম এতই বেশী। তাই এই ওয়েস্ট-এণ্ডের দামী হোটেলগুলিতে সব সময় অনেক জায়গা খালি থাকে।

রাস্তায় হাজার লোকের ভিড় থাকলেও এতটুকু শব্দ নেই। রাস্তায় বড একটা কেউ কথা বলে না। চোখে পড়ে নানা বয়সের নানা রকম লোক রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছে মুখ বুজে। পাশের সঙ্গীর সঙ্গে হয় তো তারা মাঝে মাঝে কথা বলছে, কিন্তু এত আস্তে যে পাশের সঙ্গীটি শুনতে পাচ্ছে কিনা বোঝা কঠিন।

শুধু মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে কথা বলে বিদেশীরা। বলেই কিন্তু তারা ভুল বুঝতে পারে। পাশের লোকগুলো অবাক হয়ে তাকায় তাদের দিকে।

তাই নানা দিক থেকে প্রথম প্রথম বিদেশীদের লণ্ডনে এসে বেশ

অসুবিধা হয়। মনে হয় কলের পুতুলের প্রাণহীন রাজ্যে কে যেন তাদের ছেড়ে দিয়েছে।

আরও অবাক হয় তারা গাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে। হাজার হাজার গাড়ী চলছে কিন্তু একবারও হর্ণ বাজছে না। ট্র্যাফিক সিগন্যালের সংকেতে যথারীতি একটির পিছনে আর একটি চলেছে।

সিনেমা হাউসের সামনে লম্বা 'কিউ' ক'রে কতো লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মুখে যেন তাদের চাবি দেয়া। শুধু গাড়ীর আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারপাশ ঝকঝকে তকতকে — দেখলেই বোঝা যায় লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ।

লেস্টার স্কোয়ার টিউব স্টেশনের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে লম্বা রাস্তা — চেয়ারিংক্রস্ রোড। এই রাস্তায় যেখানে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'ইণ্ডিয়া গ্রীল্', তার সামনে পথিকের দল অবাক হ'য়ে থমকে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে যখন গ্রীলের দরজা খোলা থাকে, তখন ভেতর থেকে ভেসে আসে দেয়াল-ফাটানো হাসি, নানা তর্ক-আলোচনার খণ্ড। লোকে কৌতূহলী হয়ে ভেতরে উঁকি মারে। দেখা যায় সেখানে ভারতীয়ের ভিড়। ব্যাপার বুঝতে পেরে তারা মনে মনে হেসে চলে যায়। বিদেশী না হ'লে সব সময় এমন প্রাণ খুলে হৈ-হল্লা করবে কে!

লণ্ডনের প্রায় প্রত্যেক রেস্তোরাঁর বাইরে 'মেনু' ঝোলানো থাকে। তাতে খদ্দেরের সুবিধা হয়। দাম জেনে তারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু এখানে কিছুই নেই। শুধু বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে, ইণ্ডিয়া গ্রীল্। তার নিচে একটু ছোট অক্ষরে লেখা, রোজ রাত্তির বারোটা অবধি এই রেস্তোরাঁ খোলা থাকে।

সেটা একটা মস্ত সুবিধা বৈকি। দশটার পর কপাল ভালো হ'লে হয়তো দু'একটা রেস্তোরাঁ খোলা পাওয়া যায়। সিনেমা কিংবা থিয়েটার দেখে বেরিয়ে ক্ষুধার্ত দর্শক বেশীর ভাগ রেস্তোরাঁর দিকে তাকিয়ে

দেখে লেখা রয়েছে, ক্লোজড্। তখন হতাশ হ'য়ে হুড়মুড় ক'রে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তারা ঢুকে পড়ে এই ইণ্ডিয়া গ্রীলে। কাজেই খদ্দেরের অভাব নেই ভূপাল মল্লিকের। মাসে মাসে মোটা টাকা নিয়মিত সে বাড়ীতে পাঠায়।

অন্যান্য রেস্তোর্াঁর তুলনায় দাম প্রায় দ্বিগুণ হলেও কারি-রাইসের লোভে অনেক ইংরেজ আসে ইণ্ডিয়া গ্রীলে। ভারত-ফেরৎ ইংরেজরা মাঝে মাঝে মাতব্বরি চালে বলে ভূপালকে, বড়ো বেশী দাম নিচ্ছ মালিক, ভারতবর্ষে যখন ছিলাম তখন এক টাকায় এর ডবল্ খেয়েছি —

হেঁ হেঁ, হাত কচলে ভূপাল উত্তর দেয়, আমাদের দেশের সঙ্গে এ দেশের খরচের তফাৎ জানেনই তো স্যার —

ইংরেজ গুব গুব ক'রে মাংস-ভাত খেয়ে যায়, আর কথা বলে না। কিন্তু সাহেব বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় বলে ভূপাল, বেশী দাম তো গিলতে আসিস কেন বেটারা, তোদের মত খদ্দেরের থোড়াই ধার ধারি আমি, আমার দেশের লোকই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে —

ঠিক বলেছেন মল্লিক সাহেব, পাশে দাঁড়িয়ে রতন সায় দেয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। লণ্ডনে এখন বহু ভারতীয়। তারা সকলেই এই ইণ্ডিয়া গ্রীল্ খুঁজে বের করেছে। আর কারি-রাইসের যতই দাম নিক না কেন ভূপাল, তারা তো আসা কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। ফলে বিদেশী খদ্দের আসুক বা না আসুক ভূপাল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রতন মেরী আর আইলীন, এরা করে পরিবেশন। রান্না করে মকবুল মেহের আলী, বিপিন। জোগাড় দেয় রিচার্ড — মাদ্রাজী খৃষ্টান। আর বাসন মাজে ষাট বছরের বুড়ি রোজ্ আর ঠোঁট কাটা, ভুরু কুচকানো ট্যারা জার্মান মেয়ে ফ্রিডা। হিসেব দেখে ভূপাল নিজে, আর মাঝে মাঝে খদ্দেরকে খাতির যত্ন করে। দরকার হ'লে নিজেও হন্তদন্ত হ'য়ে পরিবেশন করতে দ্বিধা করে না।

এই নিয়েই লেস্টার স্কোয়ারে ইণ্ডিয়া গ্রীল্। কোন গোলমাল নেই, সবাই মনের সুখে দিব্যি মিলে মিশে আছে। সবাইকে নিয়ে ভূপাল ভারী খুশী।

প্রথম প্রথম মেরী আর আইলীনকে নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হোত। কিন্তু আজকাল ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সহজেই মনের ভাব বুঝিয়ে দিতে পারে রতন আর ভূপাল। আর ওদেরও ইণ্ডিয়ানদের ইংরেজী শুনে শুনে এখন কান ঠিক হ'য়ে গেছে — চট ক'রে বুঝে নেয় যে ওরা কি বলতে চায়। আর 'রসগোল্লা,' 'সুপারি,' 'সন্দেশ' — এ কথাগুলোও বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে মেরী আর আইলীন।

মেরী রেস্তোরাঁয় আসে সকাল দশটা সাড়ে দশটায়। তার কিছু আগে আসে রান্না করবার লোকেরা। কিন্তু তাদেরও আগে রেস্তোরাঁয় এ'সে থাকে ভূপাল আর আইলীন। দু'জনে মিলে ব্রেকফাস্ট তৈরী ক'রে এর মধ্যেই খাওয়া সেরে নেয়। ভূপালের গ্রীলে খদ্দেরের জন্যে ব্রেকফাস্ট কিংবা বিকেলবেলা চায়ের বন্দোবস্ত থাকে না। শুধু লাঞ্চ্ আর ডিনার। লাঞ্চ্ খাবার রীতি দুপুর একটা হ'লেও পৌনে বারোটা থেকেই খদ্দের আসতে আরম্ভ করে, আর তার জের চলে দুপুর তিনটে অবধি। নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না তখন। লাঞ্চের হাঙ্গাম চুকতে না চুকতেই সাড়ে পাঁচটা থেকে আসতে আরম্ভ করে ডিনারের খদ্দের। ব্যাস্, তারপর রাত বারোটা অবধি প্রত্যেকে নিশ্চিন্ত।

রবিবারেও খোলা থাকে ইণ্ডিয়া গ্রীল। তবে রবিবারের লণ্ডন দেশে হরতালের মতো। চারপাশ নিঝুম। খদ্দেরেরও ভীড় থাকে না সেদিন। তাই ভূপাল আর আইলীন চালিয়ে দেয় পরিবেশনের কাজ। রান্না করবার লোক শুধু একজন আসে সেদিন। আর সকলের ছুটি।

রাত্তির বেলা গ্রীল্ বন্ধ করবার আগে চাদর তুলে চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর তুলে রাখে ওরা। তাতে ঘর পরিষ্কার করবার সুবিধা হয়।

পরদিন সকালে দু'জনে মিলে ভাল ক'রে ঘর ঝাড় দেয়, টেবিলের ওপর থেকে চেয়ার নামিয়ে টেবিল সাজায়। ফুলদানের ফুল অনেকদিন থাকে এদেশে, কাজেই বদলাতে হয় না রোজ রোজ। ছুরী, কাঁটা, চামচ অ্যাস্‌ট্রে এনে ওরা ভরিয়ে দেয় টেবিলগুলি একে একে। আর ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় ভূপাল নিজেই দরজার পিচ্‌বোর্ডের ছোটো ফলক 'ক্লোজড্‌' উল্টে 'ওপন্‌' করে দেয়।

অসময়ে অনেক বাঙালী ছাত্র দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে ছুটে আসে ভূপাল তাদের কাছে। যদিও এখন ভালো কিছু নেই, তবু দেশের ছেলে আপনারা, এসেই যখন পড়েছেন, শুধু মুখে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না আপনাদের, কি চাই বলুন ?

ভাত-মাংস পাওয়া যাবে নাকি ?

কিছু হয়নি স্যার এখনও, টু আর্লি আপনারা। রসগোল্লা খান না, ভালো সন্দেশ দেব ?

তাই দিন।

ছুটে গিয়ে ভূপাল বড় বড় প্লেটে ছোটো ছোটো রসগোল্লা আর পুরানো পয়সার মতো সন্দেশ নিয়ে আসে, আর কিছুই নেই এখন স্যার — সরি।

বাঙালী খদ্দের এলে বিশেষ ব্যস্ত না থাকলে আইলীন এসে প্রায়ই গল্প জুড়ে দেয় সঙ্গে, ছাত্র বুঝি ?

হ্যাঁ।

নতুন এসেছো ?

হ্যাঁ।

সকলে একসঙ্গে এসেছো নাকি ?

আরে না না, একটা রসগোল্লা মুখে পুরে একজন বলে, আমি আছি তিন বছর — তোমার নাম কি ?

আইলীন।

বাঃ আইলীন, সুন্দর রসগোল্লা কিন্তু তোমাদের।

আর একজন বলে, সন্দেশও ভালো।

আমাদের সব কিছুই ভালো, হেসে বলে আইলীন, তুমি তিন বছর আছো অথচ তোমাকে আগে এ রেস্তোরাঁয় তো কখনও দেখি নি।

আমি লণ্ডনে থাকি না কি-না —

কোথায় থাকো ?

শেফিল্ডে।

ও, কিন্তু লণ্ডনে এলেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসো এখানে।

এই তো এসেছি, রসিকতা করে বাঙালী ছাত্র।

দু'টি দু'টি ক'রে রসগোল্লা আর সন্দেশ খায় ওরা। সব শুদ্ধ ওরা তিন জন। বিল দেয় ভূপাল বারো শিলিংএর অর্থাৎ আট টাকার। তা'ছাড়া আবার আলাদা টিপ্‌স্।

বাইরে বেরিয়ে ছেলেরা বলে, খুব হয়েছে, আর খাবে লণ্ডনে সন্দেশ রসগোল্লা ?

জীবনে আর ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ নয় বাবা।

কে বলে বাঙালীর ব্যবসায় মাথা নেই।

লণ্ডনে এসে মাথা খুলেছে ব্যাটার।

মাথা আছে বৈকি ভূপালের — ব্যবসায় বেশ মাথা আছে তার। সে জানে সন্দেশ রসগোল্লা ভাত না খেয়ে কতদিন আর বিলেতে থাকতে পারে বাঙালী। আর বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে! ভূপালকেও তারা রেখেছে বৈকি — রাজার মতো সুখে রেখেছে।

মাঝে মাঝে ছোটখাটো গোলমালও বাধে বৈকি রেস্তোরাঁয়। কিন্তু 'তা' নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না ভূপাল। শান্ত হয়ে চুপেচাপে চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তা'তে তার দু'চার পাউণ্ড অর্থদণ্ড গেলেও সে গ্রাহ্য করে না কিছু। বড়ো ঠাণ্ডা মাথা ভূপালের।

হয়তো একদিন সকাল বেলা সকলে আসবার আগে 'ক্লোজড্‌' দরজা ঠেলে ঢুকলো এক ইংরেজ। ছেঁড়া ওভারকোট তার গায়ে, ময়লা জুতো, দাড়ি কামায়নি দু'দিন।

ভূপালের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললো, গুড্‌মর্ণিং!

গুড্‌মর্ণিং, কি চাই আপনার?

মিঃ মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমিই মল্লিক।

ও, আরে তাই নাকি? আমার নাম বিল্‌—তোমাদের মেরীর স্বামী।

ব'সো ব'সো বিল্‌, বড় খুশী হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে।

সেলাম্‌ ইণ্ডিয়ান, যুদ্ধের সময় তোমাদের দেশে ছিলাম কিছুদিন। বড়ো সুখে ছিলাম।

চা খাবে বিল্‌?

না মালিক, ধন্যবাদ। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে পারি কি?

নিশ্চয়ই।

মেরী বলতে পারে নি তোমাকে—আমাদের বিশেষ দরকার, তিন পাউণ্ড তার মাইনে থেকে যদি আগাম দাও—

এখুনি দিচ্ছি, ভূপাল ড্রয়ার খুলে পাউণ্ডের তিনটি নোট গুঁজে দিল বিলের হাতে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিল্‌ বেরিয়ে গেল।

মেরী এসে সমস্ত শুনে চীৎকার ক'রে উঠলো, এসেছিলো—এখানেও এসেছিলো? চোর! ওকে পুলিশে দাও মালিক। সারাদিন পরিশ্রম করি ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে, লজ্জা করে না ওর আমার টাকা এমনি ক'রে চুরী করতে! আমি ওকে ডিভোর্স করবো—

আহা হা, রাগ কোরো না মেরী, ঘাবড়ে গিয়ে বলে ভূপাল, দোষ·

আমার। আমার উচিত ছিলো তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে তুমি এলে তোমার মত নিয়ে ওকে টাকা দেয়া —

আমার সামনে তোমাকে টাকার কথা বলতে সাহস পাবে ও? একটা পাঁড় মাতাল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে ওর? আমার সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের টাকা —

যাক্‌গে যাক্‌গে, আমার সমস্ত দোষ। ওর জন্যে ভেবো না তুমি মেরী, আমি আবার দেবো তোমাকে ওই টাকা।

ডিভোর্স করবো মাতালটাকে আমি। দাঁড়াও না, আজ বাড়ী গিয়ে আমি মজা দেখাচ্ছি ওর —

অনেক কষ্টে মেরীকে শান্ত করে ভূপাল।

কিন্তু পরদিন সকালে ঠিক সেই সময় আবার ফিরে এলো বিল্‌। ভূপালকে দেখে হেসে হাত তুলে বললো, সেলাম্‌ ইণ্ডিয়ান! কি কাণ্ড করে আমার পাগলী স্ত্রী বল তো? সকালে বললো তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতে, আর রাত একটায় ঘুম থেকে তুলে আমাকে বলে আজ সকালে তোমাকে টাকা ফেরৎ না দিয়ে গেলে ডিভোর্স করবে আমাকে। নাও মালিক তোমার টাকা। ও ডিভোর্স করলে বড়ো অসুবিধা হবে আমার —

মেরী আসতেই ভূপাল বললো, তোমার স্বামী টাকা ফেরৎ দিয়ে গেছে আজ সকালে —

কি? লাল হ'য়ে গেল মেরীর সমস্ত মুখ, কত বড় বদমাস দেখ! অথচ কাল আমার কাছে কিছুতেই স্বীকার করলো না যে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে —

আইলীন ফিক্ করে হেসে ফেললো। ভূপাল কি করবে ভেবে না পেয়ে একবার মেরীর আর একবার আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে হিসেবের খাতাটা টেনে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

কিন্তু পরের দিন ভূপালের ঘাড়ে হাত রেখে বললো মেরী, আমার একটা

কথা শোন মালিক ডিয়ার্, বিল্ বড়ো সরল লোক। শুধু নেশা করলে জ্ঞান থাকে না — এই যা দোষ। তবে ভালবাসে আমাকে খুব। আজকালকার দিনে ক'জন স্বামী এমন হয়?

ভূপাল বলে, তা বৈকি মেরী।

মাঝে মাঝে এমনি আরও অনেক ঘটনা ঘটে। সব দিকেই চোখ রাখতে হয় ভূপালকে। লণ্ডনের মতো শহরে একটা রেস্তোরাঁ চালানো কি সোজা কথা। ভূপাল নিজেকে নিজেই বাহাদুরী দেয় মনে মনে।

একবার একজন অল্পবয়সী মেয়ে এসেছিলো এখানে কাজ করতে। সকলেরই চোখ পড়েছিল তার ওপর। কিন্তু তখন প্রথম প্রথম, কেউ বেশী এগোতে সাহস পায় নি। শুধু সেই জোগাড়ে মাদ্রাজী খৃষ্টান রিচার্ড হঠাৎ একদিন খপ্ ক'রে মেয়েটির হাত ধরে বলেছিলো, আই লাভ ইউ —

আর যাবে কোথায়! তখুনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল মেয়েটি। যাবার আগে বলে গেল, ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে আর জীবনে নয়, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না ওরা।

রিচার্ড বেচারা ইংরেজ মেয়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করে নি। লজ্জা পেয়ে ভেবে পেলোনা কি করবে।

কর্তব্যের খাতিরে রিচার্ডকে ডেকে ভূপাল মিষ্টি ক'রে কঠিন উপদেশ দিলো, একটু বুঝে শুনে কাজ করবে। রেস্তোরাঁর এরকম দুর্ণাম হ'লে বিদেশী হয়ে এদেশে আমি ব্যবসা চালাবো কেমন করে? আর জানোই তো এখন ওয়েট্রেস্ পাওয়া কি রকম শক্ত। বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছে করো আমি একটি কথাও বলবো না।

আমি খুব দুঃখিত, ভূপালের কাছে মাপ চাইলো রিচার্ড।

সে চ'লে গেলে আপন মনেই বললো ভূপাল, হাত ধরেছে তো জাত গেছে, ইংরেজ ছুঁড়ির আবার সতীত্ব — আর কত রঙ্গ দেখাবে মা!

আর একটা কথা মনে করলে একটু দুঃখ হয় ভূপালের। অতটা কঠোর

না হ'লেই হ'তো হরির ব্যাপারে। আসলে কিন্তু দোষ কিছুই ছিলো না হরির। তবু রিচার্ডের ঘটনার পর একটু বেশী সতর্ক হ'য়ে পড়েছিলো ভূপাল। সব চেয়ে আগে তার রেস্তোরাঁর সুনাম। না হ'লে ইণ্ডিয়ানদের ওপর কি ধারণা হবে বিদেশীদের ?

হরি যখন চাকরী করতো এখানে, ডরোথিও ছিল তখন। তিন ছেলের মা ডরোথি, স্বামীও বেঁচে আছে। খুব ভালো মেয়ে। ভূপালেরও বড়ো মায়া পড়েছিলো তার ওপর। সে লক্ষ্য করতো হরি প্রায়ই তার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করে। দেশের ছেলে হরি তাই তাকে ডেকে বার বার সাবধান ক'রে দিলো ভূপাল, মনে রেখো হরি, বিয়ে হ'য়ে গেছে ওর। তিন ছেলের মা। একটু এদিক-ওদিক হ'লে যদি ফস্ ক'রে চাকরী ছেড়ে চ'লে যায় তাহ'লে মহামুস্কিলে পডবো আমি —

কিন্তু কে শোনে কার কথা! শুক্কুরবার রাত্তির দশটায় ছুটি নিয়ে হরি আর ডরোথি একসঙ্গে তারই চোখের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। পরদিন হরি এলো যথাসময়ে কিন্তু ডরোথি এলো না।

ডরোথি কোথায় ? গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভূপাল।

আমি কেমন ক'রে জানবো ?

আরও গম্ভীর হ'য়ে ভূপাল বললো, বুঝেছি। অনেকবার তোমাকে সাবধান করেছি হরি, কিন্তু — যাকৃগে মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি, চ'লে যাও, আজ থেকে আর চাকরী করতে হবে না তোমাকে।

ডরোথি এলো দিন তিনেক পর।

অসুখ ক'রেছিল খবর দিতে পারিনি মালিক —

ভূপাল বললো, আমি ভেবেছিলাম ইণ্ডিয়ানদের ওপর রেগে তুমি চাকরী ছেড়ে দিলে বুঝি ?

ওমা, রাগবো কেন ?

হরি খারাপ ব্যবহার করেছে না তোমার সঙ্গে ?

না তো। সুন্দর ছেলে হরি। কোথায় সে?

তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি?

কেন? কি ব্যাপার খুলে বল তো শুনি?

কিন্তু বলবে আর কি ভূপাল। সে-ই সমস্ত শুনলো ডরোথির কাছে। ডরোথি বললো, হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বটে তার ঘরে। কিন্তু তা'তে কি হয়েছে? খুব ভাল লাগে আমার হরিকে। সে-রাত্তিরে হরি আমাকে ব'লেছিলো, আজ তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে ভূপাল রেগে গেছে, তোমাকে ভূপাল খুব পছন্দ করে ডরোথি। ঠিকই বলেছিলো হরি।

কে বুঝবে মেয়েদের মন! এবার ভূপালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে চাকরী ছেড়ে দিলো ডরোথি। ভুল করে বৈকি ভূপাল। কোন মানুষই বা থেকে থেকে ভুল না করে? সেকথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ভূপাল।

শনিবার রাত্তিরে রতন বললো, মল্লিক সাহেব, এবার বাইরের দরজার 'ওপন্'টা উল্টে 'ক্লোজড্' করে দি?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভূপাল বললো, এখনও বারোটা বাজতে প্রায় কুড়ি মিনিট বাকি —

তা' হোক, অবার নতুন খদ্দের এলে দিতে থুতে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে না?

আর একটু থাক্, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন অতো? তুই-ই তো টিপ্স্ পাবি বাপু আরও —

লাস্ট্ টিউবে বাড়ী যাই, সেটা মিস্ করলে কি অবস্থা হবে বোঝেন তো?

আচ্ছা আচ্ছা দে 'ক্লোজ্ড' ক'রে, বড়ো কথা বলতে শিখেছিস আজকাল তুই।

খাওয়া-দাওয়া সুযোগ বুঝে একসময় সেরে নিয়েছে রতন। এইবার গরম জলে মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা আর একবার ভালো ক'রে বেঁধে নিলো। রেস্তোরাঁ একেবারে খালি, আর কোন খদ্দের নেই এখন।

রতনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আইলীন বললো, এত গম্ভীর মুখ কেন তোমার রটন্ ?

তুমি আমার সঙ্গে একদিনও বাইরে যেতে চাও না ব'লে।

এই ঠাণ্ডায় কেমন ক'রে বাইরে যাবো ?

হেসে রতন বললো, তাহ'লে আমার ঘরে চলো।

আইলীনও হাসলো, অনেক দূর যে।

ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে যাবো।

হুঁ ? এত পয়সা তোমার ?

মেয়ে-বন্ধু নেই কিনা, তাই পয়সা থাকে।

বেচারী রটন্ !

রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁকলো ভূপাল, কিরে রতনা, এখন লাস্ট টিউব মিস্ করবার কথা মনে হয় না যে ?

হেসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো রতন, মল্লিকের হিংসে হচ্ছে আইলীন।

আইলীনও হেসে বললো, খুব স্বাভাবিক।

গুড্ নাইট, আইলীনের হাত চেপে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রতন।

একে একে বেরিয়ে গেল ইণ্ডিয়া গ্রীলের সকলেই। অনেকবার অনেকের মুখ থেকে শুধু ভেসে এলো একটি কথা, গুড্ নাইট।

সবাই চ'লে যাবার কিছু পরে বাকি কাজ সেরে আলোগুলো পর পর নিবিয়ে দিলো ভূপাল। তারপর আইলীনকে নিয়ে নিচে নিজের ঘরে চ'লে এলো। গ্যাস্ জ্বালিয়ে বিছানায় আইলীনের পাশে ব'সে জিজ্ঞেস করলো, খুব ক্লান্ত নাকি ?

না, তুমি ?

একটু — সকাল থেকে রাত্তির অবধি যা পরিশ্রম করতে হয় !

বেচারী ভূপাল, সিগ্রেট বের ক'রে আইলীন বললো, খাবে ?

আমি সিগ্রেট খাই ?

সিগ্রেট খাও না, মদ খাও না — আশ্চর্য মানুষ তুমি।

আমাদের দেশে খারাপ লোকেরা মদ খায়।

ভূপালের কাঁধে মাথা রেখে আইলীন বললো, তুমি খুব ভালো লোক।

আর তুমি খুব ভালো মেয়ে।

হেসে আইলীন বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে ভূপাল।

ঘুমোও।

তোমার ঘুম পায় নি ?

তাড়াতাড়ি হাই চেপে ভূপাল বললো, না।

তাহ'লে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

বেশ।

সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে আইলীন বললো, বড় রোগা হ'য়ে যাচ্ছো, একটু বিশ্রাম করা দরকার তোমার ভূপাল।

হেসে ভূপাল বললো, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই আইলীন।

কেন ?

ব্যবসা দেখবে কে ?

রঞ্জন। খুব বুদ্ধিমান লোক ও। ওর ওপর গ্রীলের ভার দিয়ে তুমি কোথাও ঘুরে এসো।

একটু গম্ভীর হ'য়ে ভূপাল বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি আইলীন ?

হুঁ হুঁ।

রঞ্জনকে তুমি খুব বেশী পছন্দ কর, না ?

হ্যা, খুব বেশী।

আমার চেয়েও বেশী ?

হেসে বললো আইলীন, কেন, তোমার হিংসে হয় বুঝি ?

আমি তোমাকে ভালোবাসি আইলীন !

আমি জানি।

কিন্তু সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

তুমি সেকথা জানো না ভূপাল ?

জানি।

তাহ'লে বারবার এক কথা জিজ্ঞেস কর কেন ?

আমার কেবলই ভয় হয় যে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে —

যা-তা ব'কো না।

ব'ল তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না ?

না।

কখনও না।

কখনও না।

তোমাকে না হ'লে আমার একদিনও চলবে না আইলীন, আমি বাঁচতে পারবো না, ভূপাল আইলীনের আরো কাছে স'রে এলো।

অনেক রাত্তিরে আইলীন ঘুমিয়ে পড়বার পর ভূপাল আস্তে আস্তে উঠে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবে। তারপর ড্রয়ার থেকে চিঠি লেখবার কাগজ বের ক'রে সেই রাত্তিরেই স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসে। দিনের বেলা সময় হয় না তার। ভূপাল লেখে —

প্রিয়তমে সুখদা,

এ মাসে তোমাদের এক হাজার টাকা পাঠাইয়াছি, আশা করি পাইয়াছ। শীঘ্রই আরও পাঠাইতে চেষ্টা করিব। এই বৎসরের শেষের

দিকে কয়েক মাসের জন্ত দেশে যাইতে পারি। পূজার বাজনা শুনিতে বড় সাধ হয়। আশা করি তোমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। বড় খুকী ছোট খুকী ন্যাড়া পটল বুড়ো — ইহারা কেমন আছে? সব সংবাদ জানাইয়া চিন্তা দূর করিবে —

এতটা লিখে ভূপাল ভেবে পায় না আর কি লিখবে। খোলা কলম হাতে নিয়ে ঘুমন্ত আইলীনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আর নিঃশব্দে রাত বেড়ে চলে।

তবু কিছুতেই ঘুম আসে না ভূপালের।

২

খাঁটী ওয়েস্ট এণ্ড্ যেমন পিকাডিলি, তেমনি আসল ইস্ট এণ্ড্ হ'লো অল্ডগেট। লণ্ডনের অপরিচ্ছন্ন নগণ্য দীন পল্লী। হাড় বের করা জীর্ণ বাড়ীগুলি যেন কোনো রকমে টিকে আছে। দিন-মজুরের ছেলে মেয়েরা সারাদিন চীৎকার ক'রে রাস্তায় খেলা করে। আর মাঝে মাঝে ভেসে আসে ভ্যাপসা গন্ধ।

এ পাড়ার লোকের মুখের কোনো বাঁধন নেই। গভীর রাত্তিরেও মাতালের দল গান গেয়ে বেড়ায়। চেহারা দেখলেই তাদের অবস্থা বোঝা যায়। আদব-কায়দা ভদ্রতা-বিনয়ের ধার ধারে না এরা। দরকার মনে করলে রাস্তায় ঘুষোঘুষি করতে ইতস্তত করে না। মেয়েদেরও মুখ দেখলে বোঝা যায় যে তারা এ পাড়ার মেয়ে। রাত্তিরে তাদের শাণিত কণ্ঠস্বরে প্রায়ই গৃহস্থের তন্দ্রা ভাঙে।

না বললেও চলে এ পাড়ায় গরীবের বাস। অল্প ভাড়ায় গোটা বাড়ী কিংবা ফ্ল্যাট অথবা ঘর সহজেই পাওয়া যায়। জিনিস-পত্রের দাম ওয়েস্ট এণ্ডের দোকানগুলির তুলনায় অনেক কম। সাধারণত অল্ডগেটে বাস করে কাগজের হকার, ফলওলা, কুলি-মজুর আর গরীব ইণ্ডিয়ানের দল।

সেই সব ভারতীয়, যারা এসেছিলো টাকা রোজগার করতে, ছোটখাটো ব্যবসা খুলতে কিংবা জাহাজের খালাসী হ'য়ে, কিন্তু নানা কারণে যারা আর দেশে ফিরে যেতে পারে নি, এদেশেই সংসার পেতেছে, তারা অনেকে মিলে ভাড়া নিয়েছে একটা পুরানো বাড়ী। চাঁদা ক'রে বাজার করে, পালা ক'রে রান্না করে, ঝগড়া-তর্ক করে, তারপর আবার মিটমাট ক'রে সুখে দিন কাটিয়ে

দেয়। যদি এমনি ক'রে না থাকতো, তাহ'লে লণ্ডনে হয়তো ওদের উপোস ক'রে মরতে হ'তো। কিন্তু এখন ওরা প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত। যদি অনেক সপ্তাহ কারুর আয় একেবারে বন্ধ থাকে তাহ'লেও কিছু যায় আসে না। ওরা ভাগাভাগি ক'রে চাঁদা করে চালিয়ে দেয়।

ঘরগুলোতে আর এতোটুকুও জায়গা নেই। চারপাশে জমা ভাঙা ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া কম্বল, খবরের কাগজের স্তূপ, নোংরা জুতো, ময়লা মোজা আর নানা জিনিস। তার ওপর মাঝে মাঝে অতিথি আসে। যখন শীতকাল হ'লেও এরা মাটিতে পুরু বিছানা করে নেয়। যারা এখনও জাহাজে চাকুরী করে তারা এখানে আসে ছুটি কাটাতে। মদ টানে, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে। তারপর ছুটি ফুরোলে আবার ফিরে যায় বন্দরে।

রাত বারোটার অনেক পরে শেষ টিউবে রতন বাড়ী এসে পৌঁছলো। চারপাশ ঘন কুয়াশায় অন্ধ ডাইনীর মত ভগ্ন জানু নিয়ে যেন তীব্র মাদকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের ক'রে দরজা খুলে রতন সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো। কাঠের দুর্বল সিঁড়ি তার পায়ের চাপে তীব্র আর্তনাদ করতে লাগলো যেন। নিজের ঘর খুলে আলো জেলেই চমকে উঠলো রতন — কে যেন শুয়ে আছে তার খাটে।

কিরে রতন এলি? চোখ খুলে বিষ্টু বললো, জাহাজ সারানো হচ্ছে লিভারপুলে, মাস খানেক ছুটি —

আরে বিষ্টুদা যে, আমি তো চমকে উঠেছিলাম।

বোস্ বোস্ রতন, বিষ্টু খাটের ওপর ব'সে কম্বলটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিলো।

ওভারকোট খুলে দরজার হুকে টাঙিয়ে রাখলো রতন। তারপর চেয়ারে ব'সে বললো, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

হ্যাঁ, খাতির খুব করেছে তোর বন্ধুরা, এক পেট খাইয়ে তবে ছাড়লে।

বাঃ, একটা সিগ্রেট বিষ্টুকে দিয়ে বললো রতন, তারপর কেমন আছ বল বিষ্টুদা ?

আছি ভালোই, তুই কেমন আছিস রত্না বল্ ?

ভালোই, বড়ো হাই চেপে বললো রতন।

বিষ্টু বললো, চেহারাটা বেশ হয়েছে তোর, এবার একটা বিয়া-সাদি কর্ —

হেসে বললো রতন, দাও না একটা দেখে —

বন্ধু পাস নাই এখনও ?

কই আর !

এদেশে সবাই তো পায় রে রত্না, যার বউ সে নিজেই খুঁজে নেয়।

রতন বললো, কপাল মন্দ আমার।

হোটেলে মেয়ে নাই তোর ?

আছে।

তাদের ধর না একটারে।

না বিষ্টুদা, হেসে বললো রতন, ভালো লাগে না তাদের আমার।

পছন্দ মতো মেয়ে পাওয়া মুস্কিল রে রত্না, একটু গম্ভীর হ'য়ে বললো বিষ্টু, পারলে লিভারপুরের মেয়ে বিয়া করিস —

কেন ?

বড়ো সৎ হয় ওরা রে।

আর আমাদের দেশের মেয়ে ?

তুড়ি মারতে মারতে হাই তুলে বিষ্টু বললো, হ্যাঁ সৎ বটে, তবে বড়ো ঠাণ্ডা। এদেশের মেয়েদের তাপ মাথা খারাপ ক'রে দেয় রে রত্না !

রতন হেসে জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি বিষ্টুদা ?

এতদিন বিলাতে থেকে একথা আবার জিজ্ঞাসা করিস !

যাক্‌গে, সিগ্রেট জুতোর তলায় চেপে নিভিয়ে ফেলে বললো রতন, দেশের কি খবর, বউ কেমন আছে তোমার ?

কি জানি, খুড়ার একটা চিঠি আসলো কাল সকালে —

ভালো আছে তো তারা ?

খারাপ থাকবার তো কোন কারণ নাই। তবে চিঠিটা খুলি নাই এখনও, আছে কোটের বুক পকেটে।

অবাক হ'য়ে রতন বললো, বাড়ীর চিঠি এখনও খোল নাই, দেশের খবর জানতে ইচ্ছে হয় না তোমার ?

একটুও উৎসাহিত না হ'য়ে বিষ্টু বললো, খবর আবার কি, খবর তো সেই এক, খুড়া টাকা পয়সা চায় হয় তো আবার —

তাহ'লেও দেশের চিঠি, একটু পড়না শুনি ?.

হেসে বিষ্টু বললো, দেশের থেকে চিঠি-পত্র পাস না বুঝি তুই ?

না, গম্ভীর হ'য়ে গেলো রতনের মুখ, দেশের কে আর আমাকে চিঠি লিখবে ?

তবে পড়্ তুই আমার চিঠি, দেখ্ কোটের পকেটে আছে।

তোমার চিঠি আমি পড়বো কি ?

দেশের খবর জানতে সাধ তোর, আর খুড়ার চিঠি পড়লি তা'তে হয়েছে কি ? নে, জোরে জোরে পড়্, আমিও শুনি —

রতন উঠে বিষ্টুর কোটের পকেট থেকে সেই এয়ার-লেটার নিয়ে খুব সাবধানে ছিঁড়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো —

বিষ্টু বাবাজীবন,

আশা করি তোমার সর্বপ্রকার কুশল। বহুবার তোমাকে পত্র লিখিয়া কোন উত্তর পাই নাই। যাহা হউক আর লিখিবো না। তোমাকে শুধু একটি দুঃসংবাদ দিবার জন্য এই শেষবার লিখিতেছি।

তুমি বিলাতে মেমসাহেব বিবাহ করিয়া আবার সংসার পাতিয়াছ শুনিয়া

আমাদের মা লক্ষী তোমার পত্নী সতী-সাধ্বী শ্রীমতী দুর্গারাণী তিন চারিদিন হইল শরীরে কেরাসীন্ তেল ঢালিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে —

কি কি কি বললি — খাট থেকে লাফিয়ে উঠে রতনের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিলো বিষ্টু। তারপর চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, আমার এ সর্বনাশ কে করলে গো — কে মিথ্যা খবর রটালে — কবে আবার আমি যেম বিয়া করলাম, বল্ তুই রতনা —

স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো রতন। সে এক দৃষ্টিতে বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটি কথাও বলতে পারলো না। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

বিষ্টুর কান্না ছাড়া তখন আর কোন শব্দ নেই। আর কারুরই ভাঙলো না ঘুম। সে-গভীর রাত্তিরে সমস্ত ইস্ট এণ্ড্ একেবারে নিস্তব্ধ।

সারা রাত কেঁদে কেঁদে সকাল বেলা বিষ্টু ঘুমিয়ে পড়লো। তার কান্নার আওয়াজে রতন একেবারেই ঘুমোতে পারে নি। বিষ্টুর পাশে শুয়ে সকাল বেলাও আর তার ঘুম এলো না।

আজ রবিবার। কারুর কাজের তাড়া নেই। একসময় আস্তে আস্তে উঠলেই চলবে। হাই তুলে পাশ ফিরে রতন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। বাইরে বরফ পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বড় বেশী ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে আজ সকালবেলা। জানলার কাচ আর পুরু পর্দা ভেদ ক'রে ঘরে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া আর আরও বেশী ঠাণ্ডা হচ্ছে সেই ঘর। রতনের ইচ্ছে হ'লো উঠে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু ওঠবার কথা ভাবতেই তার সমস্ত শরীর যেন হিম হ'য়ে গেলো।

রতন ভাবছিলো বিষ্টুর বউএর কথা। বিলেতে এতোদিন থেকে একথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অবাক হ'য়ে সে ভাবছিলো, শুধু গুজবে বিশ্বাস করে মানুষ আত্মহত্যা করে কেমন ক'রে। জীবন কি এতোই সুলভ! ম'রে কি শান্তি পেলো বিষ্টুর স্ত্রী? নিজেকে জ্বালিয়ে এমন ক'রে

স্বামীকে কাঁদালো কেন? পুড়ে ম'রে কাকে কি শিক্ষা দিলো সে আর নিজেকেই বা দিলো কি? খাটে শুয়ে ছটফট করতে লাগলো রতন।

কিন্তু আর শুয়ে থাকা চলে না। এগারোটা বেজে গেছে। ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে বিষ্টুর বউএর মরার খবরটা দেয়া দরকার। ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে রতন দরজা খুললো ঘরের। প্রথমে গেলো সে দীনবন্ধুর ঘরে।

পায়ের শব্দ শুনে চোখ না খুলে বললো দীনবন্ধু, কে গণেশ, চা এনেছিস বাবা?, তারপর চোখ খুলে রতনকে দেখতে পেয়ে, বললো, ও তুই! এই ভোরবেলা উঠে পড়েছিস যে বাপ, বলি রোববার কি রোজ রোজ আসে রে?

ভোর আবার কোথায়, বারোটা বাজে —

আমারও বারোটা বেজেছে কিনা, তাই শালার তোর ঘড়িতে বারোটাই বাজুক আর তেরোটাই বাজুক — রোববার সকালে বিছানা ছেড়ে নড়ছি না বাবা, দীনবন্ধু ভালো ক'রে কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিলো।

বিষ্টু এসেছে —

জানি! বেটাকে বল্ এবার একদিন মদ-টদ খাওয়াবে। আমাদের ঘাড় ভেঙে বেটা বারবার গিলে যায় —

ওর বউ মারা গেছে —

আপদ গেছে। এইবার মনের সুখে একটা মেমসাহেবের গলায় ঝুলে পড়তে বল্ —

কেরাসীন ঢেলে পুড়ে মরেছে ওর বউ।

ও বাব্বা:, বুকের পাটা ছিলো মাগীর বল্?

আ:, রেগে বললো রতন, আত্মহত্যা ক'রে মারা গেলো বেচারী আর অমন ক'রে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

থাম্ থাম্, শালা লেকচার দিচ্ছে আমাকে। বলি কি করতে হবে শুনি? কোথায় কে মরেছে তার জন্তে সাত হাজার মাইল দূরে ব'সে

কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভেসে বম্বে গিয়ে পৌঁছতে হবে নাকি রে শালা? নিজের বউ মরলেই বা আমার কি? তা' বল্ তুমি, মরলো কেন মাগী?

কে গুজব রটিয়েছিলো বিষ্টু আবার নাকি এখানে একটা মেয় বিয়ে করেছে —

হো হো ক'রে হেসে বললো দীনবন্ধু, তাই শুনে কাল হ'লো বউএর? তা' গুজব শুনে যার মরার বাসনা জাগে তার মরাই উচিত। হিংসুটে মন ছিল বল্ মাগীর? সতীন হয়েছে শুনেই ম'লো পুড়ে। যা যা আপদ গেছে, ভালোই হয়েছে। দীনবন্ধুর কথা শুনে চোখ লাল ক'রে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রতন।

দীনবন্ধু ইণ্ডিয়া হাউসের মেসেঞ্জার। তার বয়স কত বোঝা কঠিন। পঞ্চাশের কাছাকাছি হয়তো। লোকটাকে আজকাল আর রতনের ভালো লাগে না। দেশে তার স্ত্রী আর মেয়ে অথচ তাদের নামও করে না কখনও। বলে, দেশে গিয়ে কি হবে, কবে ছেড়ে এসেছি তাদের, গতি একটা হয়েছে নিশ্চয়ই এতো দিনে — বাঙালী বউ নিয়ে ঘর করা আমার আর পোষাবে না বাবা —

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তা' এখানে থেকেই বা করবে কি?

দীনবন্ধু উত্তর দেয়, ব্যবসা করবো রে শালা, ইণ্ডিয়া হাউসে আর বেশীদিন থাকছিনা বাপু। তবে কি জানিস, ওখানে অনেক বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ হয় বলেই পড়ে আছি। শীগগিরই কাজ ছেড়ে আমি ব্যবসা ধরবো, তোরা দেখ না চুপ ক'রে —

কিন্তু শুধু বড়ো বড়ো কথাই সার। ব্যবসা ধরবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না দীনবন্ধুর। কথায় কথায় রতনের কাছ থেকে টাকা ধার চায় আর সে টাকা ফেরৎ চাইলেই রেগে যায়। বলে, মেরে দেবো নাকি টাকা আমি তোর? এতো করলাম বেটার জন্যে, মানুষ করে দিলাম শালাকে আর আমাকেই দিচ্ছিস তাগাদা, ব্লাডি সোয়াইন্ —

কিছু বলতে পারে না রতন। শুধু তার মনে হয়, হৃদয় ব'লে কিছু নেই দীনবন্ধুর। হয়তো ওদিকে মেয়েকে কোলে নিয়ে দু'মুঠো ভাতের জন্তে স্ত্রী দোরে দোরে ঘুরছে। কিন্তু পরের ভাবনায় দরকার কি তার, তাই নিজের ভাবনা ভাবে রতন।

পাশেই রান্নাঘর। সেখান থেকে গোলমাল ভেসে আসছে। কিন্তু রান্নাঘর ব'লে যে কোন কথা আছে সেকথা বোধ হয় ভুলেই গেছে এরা আজকাল। সবাই বলে, কিচেন্। বেশ বড় কিচেন্। গ্যাসের উনুন, তার পাশেই বাসন ধোবার সিঙ্ক্। অনেক চেয়ার আর পুরোনো টেবিল। র‍্যাকে রঙ-বেরঙের সস্তা কাচের বাসন — চায়ের কাপ্ ডিস্। টেবিলের ড্রয়ারে কাঁটা চামচ ছুরী, ওপরে রুটি মাখন জ্যাম মার্মলেড আর এপাশে ওপাশে ছড়ানো আলু কপি আরও অনেক তরকারী। দু ধারে দুধের ছোটো বড়ো বোতল। যার যখন ইচ্ছে কিচেনে এসে মাখন মাখিয়ে রুটিতে কামড় দেয়, দুধের বোতল শেষ করে, কিংবা কাঁচা কপি কড়াইশুঁটি আর পেঁয়াজ মিশিয়ে নুন মাখিয়ে চিবোয়।

সকালে বড় একটা ওদের দেখা হয় না। যে যার ব্রেকফাস্ট তৈরী ক'রে খেয়ে সময় মতো বেরিয়ে যায়। চৌধুরী ছাড়া লাঞ্চ্ বাইরে খায় আর সকলে। নিজের লাঞ্চ্ নিজেই ক'রে নেয় চৌধুরী। বাইরে সে বার হয় খুব কম। ব্রাহ্মণের ছেলে সে। নিজেও খাঁটী ব্রাহ্মণ। চল্লিশের ওপর বয়স। কিছুই করে না চৌধুরী। তাই সংসারের হিসেব রাখার ভার তার ওপর।

এদের কেউ যখন বলে, সংসারে এবার অন্ততঃ দু'টো পাউণ্ড দাও, বড় টানাটানি —

পয়সা? হেসে বলে চৌধুরী, পয়সা আমার কোথায়? গরীব বামুন আমি —

আর কেউ কিছু বলে না তাকে। মাঝে মাঝে শুধু দীনবন্ধু চেঁচিয়ে ওঠে, শালার বিলেতে এসেও নিস্তার নেই, এক বেটা বিটলে বামুনের পিণ্ডি

চটকাতে হবে। হাঁকা হাঁকা বিটলেটাকে — পয়সা-কড়ি দেবার নাম নেই শুধু গো-গ্রাসে গেলা বেটার। বেটাকে না হাঁকালে তোদের কপালে শুকনো কলা ঝুলিয়ে দেবে, ব'লে দিলাম আমি। শালার যত মড়া মরে এই রাজ-বাড়ীতে এসে! ইণ্ডিয়া হাউসে একটা মেসেঞ্জারের চাকরী খালি ছিলো, বললাম বেটাকে নিয়ে নিতে, তো বেটা বলে কিনা বামুন হ'য়ে চাকরের কাজ করবো কেমন ক'রে। বিনা পয়সায় গিলে প'রে থাকতে পেয়ে কুঁড়ের বাদশা হয়েছে শালা, হাঁকা হাঁকা বিটলেটাকে —

কিন্তু দীনবন্ধুর কথায় কান দেয় না কেউ। চৌধুরীকে ভালো লাগে সকলের। হাজার হোক ব্রাহ্মণ তো! তাই তার আলাদা খাতির এ বাড়ীতে। কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না চৌধুরী। নিজেকে নিয়ে নিজেই বিভোর। আমিষ খায় না সে, গভীর শীতেও শুধু নিরামিষ খেয়ে হাসিমুখে চালিয়ে দেয়।

তারই ঘরে থাকে গণেশ। আর্চওয়েতে তার ফলের দোকান। গণেশ পুরো সাহেব। বেঁটে কুচকুচে কালো আর ব্যাকব্রাশ করা চুল তার। রোজ অনেক রাত্তির অবধি গণেশ জুতো পালিশ করে, রুমাল কাঁচে, কলার আর সার্ট ইস্তিরি করে। সকালবেলা সাহেবদের মতো ফিটফাট হ'য়ে রাস্তায় বার হয়।

বাংলা একেবারেই বলে না গণেশ। দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। সে মনে করে তার জন্মভূমি এই লণ্ডন। বরাবর সে এখানেই থাকবে তারপর একদিন মেম বিয়ে ক'রে ভালো ক'রে সংসার পাতবে।

দীনবন্ধুর ঘর থেকে বেরিয়ে রতন বুঝতে পারলো সকলে জড়ো হয়েছে কিচেনে। ওখানে একেবারে মুখ ধুয়ে যাওয়া যাবে ভেবে সে বাথরুমে ঢুকলো। কিন্তু এতো চীৎকার হচ্ছে কিচেনে যে বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা শুনতে পেলো রতন। হৈ-হুল্লোড় চলেছে

কিচেনে। করবেই বা না কেন বেচারারা। এই একদিনই দেখা হয় সকলের। অন্যান্য দিন রাত্তিরে ডিনার খাবার সময় কথা বলবার উৎসাহ থাকে না কারুর— এতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে প্রত্যেকে। কোন রকমে খাওয়া সেরে যে যার ঘরে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। তাই সারা সপ্তাহের সমস্ত ক্লান্তি রবিবারে তারা উজাড় ক'রে ঢেলে দেয় হৈ-হল্লোড় আর চীৎকারে।

গান গাইছে বেচ্চো, কে বিদেশী কোন উদাসী মাইরী বাঁশেরো বাঁশী বাজালে গো —

হ্যাঁ রে বিদেশী, হেঁকে উঠলো মুন্দ, তোর বাঁশী শুনে মেম সা'ব মূর্চ্ছা যাবে রে শালা। ব'লেই সে গেয়ে উঠলো, লণ্ডনসে ছুলহান্ লায়া রে হায় বাবুজী — হায় হায় লণ্ডনসে ছুলহান্ — লণ্ডনসে ছুলহান্ — ফাটা রেকর্ডের মতো একই লাইন সে গেয়ে যেতে লাগলো।

স্টপ্, হালার পো হালারা, কোয়ায়েট, গণেশ ধরলো তার ইংরেজী গান, আই উইল টেক্ দি হাই রোড, ইউ উইল টেক্ দি লো রোড — বাব্ বাব্ বাব্ বাব্ বাব্বিঃ — কোন ছবি থেকে গানের এ দু'টি লাইন বুঝতে পেরে সে মনে রেখেছে কে জানে।

মাছের কালিয়া রান্না করছে চৌধুরী। তারই গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বাড়ীতে।— রান্নার আর কত দেরী বামুন সাহেব?

এই হ'য়ে এলো —

ক্ষুধায় প্রাণ যে যায়, এলিয়ে পড়বার ভাণ করলো শিবে।

কেউ আলু কুটছে, কেউ পেঁয়াজ কাটছে, কেউ কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছে, কেউ বাসন ধুচ্ছে আর থেকে থেকে যার যা ইচ্ছে তাই ব'লে চীৎকার ক'রে উঠছে।

কিচেনে অন্যান্য ঘরের চেয়ে ঠাণ্ডা একটু কম। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরও ওরা অনেকক্ষণ এখানে ব'সে গল্প করে। রঞ্জন সেখানে এলো যথাসময়ে।

এই যে এই যে —

হেলো হেলো —

পাইপে টান মেরে গণেশ বললো, গুডমর্নিং ইনস্‌পিপার।

ন্যারকোল গাছে কে? বলি আমার নারকোল গাছে কে রে? হেঁকো রতনকে জড়িয়ে ধ'রে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলো।

'নারকোল গাছে তোমার বাবা, উত্তর দিলো মুন্দ।

নারকোল গাছের সেই গল্প বড়দিনের ছুটিতে এদের সকলকে বলে-ছিলো রতন। নোয়াখালীতে, রতন তখন খুব ছোট, এক পাগল সারা গায়ে রাংতা প'রে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতো — হাতে তার এক লাঠি। পাগল নিজেকে মনে করতো লাটসাহেব। নোয়াখালীর সমস্ত কিছুই তার। ইচ্ছে করলে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ওদিকে, কিছু দূরে জিতেন পণ্ডিতের বাড়ী। তার বাগানে অনেক ডাবের গাছ। কিন্তু পণ্ডিতকে ছেলেরা বাঘের মত ভয় করে। অথচ কচি ডাব খাবার ইচ্ছেও তারা কিছুতে দমন করতে পারে না। তাই হতভাগা ছেলে-গুলো একদিন শরণ নিলো পাগলা লাটসাহেবের।

তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, নিবেদন আছে লাটসাহেব।

লাঠি ঠুকে হেসে লাটসাহেব বললো, বল বল নির্ভয়ে বল বাছারা, তোমরা আমার নাবালক প্রজা, ভয় কি?

সব নোয়াখালী আপনার তো হুজুর?

নোয়াখালী? হাঃ হাঃ হাঃ, তোমরা নাবালক তাই জানো না, আমি লাটসাহেব, সব ভারতবর্ষটাই আমার —

আচ্ছা লাটসাহেব, পণ্ডিত মশাইএর বাগানটাও আপনার তো?

আরে হ্যাঁ গো নাবালক প্রজা, জিতেনকে আমি দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছি ওখানে —

আপনি ইচ্ছে করলে ডাব খেতে পারেন?

ডাব? শুধু ডাব? ইচ্ছে করলে আমি কি না করতে পারি? ইচ্ছে করলে

গাছকে গাছ উপড়ে ফেলে জিতেনের মাথায় বাড়ি মেরে বের ক'রে দিতে পারি। এই দেখ না, কত ডাব চাই তোমাদের? কিন্তু দা', একটা দা' —

ছেলেরা দা' হাতে নিয়েই এসেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এই যে লাটসাহেব হুজুর! দা' হাতে নিয়ে তর্ তর্ ক'রে গাছে উঠে গেলো লাটসাহেব। আর ঘচাঘচ ডাব ফেলতে লাগলো।

মোটা গলায় জিতেন পণ্ডিত ঘরের ভেতর থেকে হাঁকলো, নারকোল গাছে কে? কোন উত্তর দেয়া দরকার মনে করলো না লাটসাহেব।

একটু পরে আবার হাঁকলো জিতেন, বলি আমার নারকোল গাছে কে রে?

এইবার লাটসাহেব পণ্ডিতের মোটা গলা নকল ক'রে উত্তর দিলো, নারকোল গাছে তোমার বাবা। লাটসাহেব আমি — আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাস্ এতো সাহস তোর —

ছেলেরা ততক্ষণে ডাব নিয়ে উধাও হয়েছে।

এ গল্প বড় ভালো লেগেছে সকলের। আর তারপর থেকে রতনের নাম দিয়েছে হেবো, নারকোল গাছে কে। হেবো কিন্তু তখনো রতনকে জড়িয়ে ধরে নাচছে আর একসুরে ব'লে চলেছে, নারকোল গাছে কে, নারকোল গাছে কে, বলি আমার নারকোল গাছে কে রে?

আঃ থাম্ থাম্, বিরক্ত হ'য়ে রতন বললো, খারাপ খবর আছে একটা —

গণেশ বললো, ইওর ফ্রেণ্ড মিঃ বিষ্টু হিয়ার, মেট হিম?

হ্যাঁ, বেচারার বউ আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে।

রতনের কথায় ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আগাগোড়া কাহিনী আবার বললো রতন।

তারা তারা, নিশ্বাস ফেলে বললো চৌধুরী, বিদেশে বেচারা কতো দুঃখ পাবে বল তো!

কেন যে দূর দেশে আসে মানুষ, বেচো গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

গণেশ জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট হি ডুয়িং পুওর বয় ?

ঘুমোচ্ছে ?

হোয়াট ? পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে বললো গণেশ, ওয়াইফ গন্ আচ্ বেও স্লিপিং — ফানি !

সকলে চুপ ক'রে রইলো। মৃত্যু অকস্মাৎ ছায়া ফেললো সেই আনন্দ-মুখর ঘরে। প্রত্যেকেই ভাবছিলো তাদের দেশের কথা — তাদের প্রিয়জনের কথা। যদি এমনি ক'রে হঠাৎ একদিন তাদেরও আত্মীয়স্বজন হারিয়ে যায় মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে ! হায় রে, এই মুহূর্তে যদি সাত হাজার মাইল দূরে পাখী হ'য়ে উড়ে যাওয়া যেতো তাহ'লে হয়তো ওরা সকলেই উড়ে যেতো সেই সোনার বাংলায়।

ওরে আমার কি হ'লো রে — চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো বিষ্টু।

সকলে ছুটে গেল তার ঘরে।

নিয়ে চল্, এখনি তোরা আমাকে দেশে নিয়ে চল্ — একদিনও নয়, আর একদিনও আমি থাকবো না এখানে, ছটফট ক'রে কাঁদতে লাগলো বিষ্টু, ওরে রতনা, কই, নিয়ে গেলি আমাকে ? —

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলো না কেউ। শুধু গজ্ গজ্ করতে করতে দীনবন্ধু কিচেনে গিয়ে লাঞ্চ্ খেতে লাগলো। এরা সকলেই শুনতে পেলো তার গলার স্বর। আপন মনে বক বক করছে দীনবন্ধু, রবিবার সকালে একটু ঘুমোবো ভাবলাম, তা সুরু হ'লো বুড়ো ধাড়ীর ডুকরে কান্না। ভাগাড় হয়েছে এই অল্ডগেট। ওরে তোরা হরিবোল দে, মিন্সের কানে মধুর হরিবোল দিয়ে বেটার প্রাণ ঠাণ্ডা কর্ —

রাগে রতনের সমস্ত শরীর যেন জ্ব'লে যাচ্ছিলো। লোকটা কি পাথর ?

গ্যাসটা যখন প্রায় নিবু নিবু তখন স্লটের মধ্যে একটা শিলিং ফেলে

বেচো হ্যাণ্ডেল্ ঘুরিয়ে দিলো। একটা শব্দ হলো — ঠক্। আবার দপ ক'রে জ্বলে উঠলো গ্যাসের আগুন।

বিকেল হ'তে না হ'তেই অন্ধকার হ'য়ে গেছে। থম্ থম্ করছে আকাশ। শুধু ঝ'রে পড়ে যেন হাজার তুলোর কণা — রেশমের মতো মৃদু আর ফুলের চেয়েও নরম। ল্যাম্প্ পোস্টের আলো ঝিমিয়ে গেল। পাতলা ঠাণ্ডা হাল্কা তুষারের ভাব ধূমের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারপাশে। জানলার কাচের গা বেয়ে ঝরছে জল — নিস্তব্ধ নিঝুম পৃথিবী।

আড়মোড়া ভেঙে গণেশ বললো, চিম্পিলি ওয়েটিং টাইম্ হালায়, লেট্ আচ্ গো আউট হালার পো হালারা —

এই শীতে কোন শালা বাইরে যায়!

আহা, বাইরে মানে কি বাইরে, গম্ভীর গলায় বললো দীনবন্ধু, ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটা ভালো ঘরে গিয়ে ঢুকবো।

কোথায়? এতক্ষণ পর কথা বললো বিষ্টু। তাকে কথা বলতে দেখে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো সকলে। কাল রাত্তির থেকে শান্ত হ'য়ে একটি কথাও বলেনি সে। দীনবন্ধু বললো আবার, 'পাবে' গো 'পাবে'। পেটে 'দু'এক ফোঁটা পড়লে সব দুঃখ ভুলে যাবে বিষ্টু বাবু।

দ্যাট্ ইজ্ ফাইন, গণেশ পাইপের ধোঁয়া ছাড়লো।

বিষ্টুর ঘাড়ে হাত রেখে বললো রতন, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই চলো বিষ্টুদা, এখানে এমন করে ব'সে থাকলে আরও মন খারাপ হবে তোমার।

যাবো? করুণ চোখে বিষ্টু তাকালো প্রত্যেকের দিকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে বৈকি, দুঃখ ভুলতে হবে তো, নাও উঠে পড় সবাই, বলে দীনবন্ধু উঠে দাঁড়ালো সকলের আগে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্কার্ফ জড়িয়ে, ওভারকোট চড়িয়ে, গ্লাবস হাতে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলো সকলে। গণেশ মাথায় পরলো একটা ফেল্ট। বাড়ীতে রইলো শুধু চৌধুরী একা। মদ ছোঁয় না সে — এক ফোঁটা বিয়ারও নয়। সবাই বেরিয়ে

গেলে আপন মনে সে বলে উঠলো, বিট্টুর বউএর আত্মাকে শান্তি দাও মা — বিট্টুকে দুঃখ ভুলিয়ে দাও — তারা — তারা !

লোকে সংক্ষেপ ক'রে নিয়ে বলে, 'পাব — মানে পাবলিক হাউস।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে এমনি অসংখ্য পাব্। সাধারণত দুটো ভাগ — পাবলিক বার আর সেলুন লাউঞ্জ। পাবলিক বারে মদের দাম দু'এক পেনি কম, তাই সেখানে মজুর শ্রেণীর ভীড় বেশী। লোকে একটা বিয়ার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে, কাগজ বই পড়ে, চিঠি লেখে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে। শীতের লণ্ডনে মন দেয়া-নেয়ার পথ সুগম করে দেয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা হ'লো এই পাব্গুলি। মদ খাওয়া এদেশে রীতি-বিরুদ্ধ নয় ব'লে মা ছেলের হাত ধরে কি বাপ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পাবে এসে আসর জমায়। ছোটো ছেলেমেয়েদের ভেতরে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই, তাই অনেক সময় দেখা যায় প্যারাম্বুলেটারে ছোটো ছেলে কিংবা মেয়েকে বাইরে রেখে মা ভেতরে গিয়ে ঢক্ঢক্ করে মদ খায়, তারপর ফিরে এসে আবার গাড়ী ঠেলে বেড়ায়। পাব্ খোলা থাকে বেলা বারোটা থেকে তিনটে অবধি আর সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত্তির এগারোটা অবধি। সাড়ে দশটায় কয়েকটা আলো ঠুক ঠুক করে নিভিয়ে বারমেইড চেঁচিয়ে ওঠে, লাস্ট অর্ডার — লাস্ট অর্ডার প্লিজ —

দীনবন্ধু সদলবলে যে মদের দোকানের পাবলিক বারে এসে ঢুকলো তার নাম অল্ডগেট আর্মস্। এরমধ্যেই ভীড় জমেছে সেখানে। বিয়ার, গিনেস আর নানা সস্তা মদের গন্ধে ঘর ভ'রে গেছে। একদল ভারতীয়কে ঢুকতে দেখে সবাই ওদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

রোজ দেখছে বেটারা, তবু কেন অমন করে তাকিয়ে থাকে বুঝিনা, গিলে খাবে যেন। দীনবন্ধু চেয়ারের আশায় এদিক ওদিক তাকালো। কিন্তু সকলের বসবার জায়গা হ'লো না, কয়েকজন পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কে কি খাবে বল ?

যা হয়, তোমার ওপরেই আমরা ছেড়ে দিলাম দীনদা —

হুইস্কি আর এক পাইন্ট্ বিয়ার নেয়া যাক্ প্রথমে ?

বেশ।

দে দে যে যার পয়সা দে।

সকলেই দিলো পয়সা, শুধু বিষ্টুকে কিছু দিতে দিলো না রতন। সে দিলো তার মদের দাম। পয়সা নিয়ে দীনবন্ধু ব্যস্ত হ'য়ে নিজের কোটের প্রত্যেক পকেট বার বার হাতড়ে বললো, ওই যাঃ, আচ্ছা মুস্কিলে পড়লাম দেখি, পয়সা যে আমার প'ড়ে আছে অন্য কোটের পকেটে —

যাও না, হেসে বললো হেবো, বাড়ী গিয়ে কোটটা বদলে এসো না, এই কাছেই তো —

হ্যাঁ আমি আবার এখন বরফ মাথায় ক'রে একা একা বাড়ী যাই — দে তো রতনা কিছু ধার, দিয়ে দেবো তোকে —

রতন নিঃশব্দে বের ক'রে দিলো পয়সা।

আড়চোখে বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে দীনবন্ধু বললো, বল্ না বেটাকে —

আঃ — রতন ইসারায় চুপ করতে বললো তাকে।

দীনবন্ধু ভীড় ঠেলে কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেসে বারমেইড বললো, ইয়েস্ স্যার ?

কথাটা শুনতে পেয়ে মুন্দ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ, খাতির কত !

দীনবন্ধু প্রত্যেককে এনে দিলো মদ। থ্যাঙ্ক ইউ, গ্লাশ হাতে নিয়ে বললো গণেশ, তারপর 'চিয়ারস্' ব'লে মদে চুমুক দিলো।

ইংরেজরা তখনও তাকিয়ে ছিলো ওদের দিকে। কি মজা পেয়েছে ওরা কে জানে। নিজেদের মধ্যে কি কথা ব'লে মাঝে মাঝে খুব জোরে হেসে উঠছে ওরা। আর কিছু না বুঝে ওদের হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেসে উঠে মুন্দ শুধু বলছে, হাসির কতা।

কেউ কিছু বললো না, শুধু বেচ্চোর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো গণেশ, হেলো হালা মুর্দ, কোয়ায়েট পিলিজ্. বি জেন্টেলমেন্ —

থাম্ তুই গনশা, বেটা বড় চাএব আমার রে —

দামী মদ খাওয়া অভ্যেস নেই বিষ্টুর। কয়েক ফোঁটা হুইস্কি পেটে পড়তেই তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো আর স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলে গায়ে পেলো হাতীর জোর। পাশেই তার বসেছে রতন, কিন্তু বিষ্টু রতনের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর ভাবছে ও দাঁড়িয়ে আছে। তাই তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কেবলই বলছে, এই রতনা শীগগির ব'সে পড়, জায়গা পাবি না, এই রতনা —। ওরা দু'জনেই যে ব'সে আছে সে কথা কিছুতেই বিষ্টু ভাবতে পারছে না। এইসময় দীনবন্ধু আবার নতুন করে করলো পরিবেশন।

রতন গণেশ আর দীনবন্ধু ছাড়া অন্য সকলের বেশ ঘোর লাগলো। বিষ্টু তো প্রায় টলে পড়ে আর কি। সামনে ইংরেজরা ঠিক তেমনি ক'রেই হাসাহাসি হট্টগোল করে যাচ্ছে। কেউ কেউ দেয়ালে টাঙানো বোর্ডে কাঠি ছুঁড়ে খেলছে, কেউ মেতে উঠেছে অন্য ঘরোয়া খেলা নিয়ে। গম্ গম্ করে জ্বলছে কয়লার আগুন আর ম্যান্টেলপিসের ঠিক ওপরেই লেখা রয়েছে, বেটিং নট এলাউড। ফাঁকে ফাঁকে বারমেইড এসে খালি গেলাসগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে বলছে কেউ কেউ, বড় ঠাণ্ডা না?

উঃ, ভয়ানক, বারমেইড কেঁপে ওঠার ভাণ করে।

শিবে বললো, মিঠা নেশা ধরছে আমার — ওকি শালা, দেখ দীনদা ইংরেজের বাচ্চা আম্মাগো পানে চাইয়া কি বলে —

নাথিং নাথিং নট মিন ইউ, গণেশ ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলো শিবেকে।

ওই শোন্ শালারা ব্লাডি ব্লুডি কয় —

দীনবন্ধু দেখলো, সর্বনাশ, এখুনি এদের নিয়ে সরে পড়তে না পারলে

একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাবে এরা। তাই তাড়াতাড়ি বললো, কিছু বলছে না আমাদের। নে এবার চল্ দেখি সব —

হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিষ্টু। তারপর চীৎকার করে উঠলো, হু সে ব্লাডি? একটা ছোকরা ইংরেজ কাউন্টারে ঘুসি মেরে বললো, সাট্ আপ্। টেল ইওর ড্যাডি সাট্ আপ্, মুখ খাঁ করে তার নাকে মারলো প্রচণ্ড ঘুসি।

যা হবার তা' তো হয়ে গেল। এক কোনায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো রতন। আর গণেশ শুধু বলছে, গড্ সেভ্, ও গড্ সেভ্—। সাহেব-সুবোর সঙ্গে মারামারি করা — সেকথা ভাবলেও লজ্জা করে তার।

ওরে থাম্ থাম্, এরকম কেউ করে না এখানে — কিন্তু কে শোনে কার কথা! দীনবন্ধুর স্বর গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল সকলের চীৎকারে, আর গেলাস-বোতল ভাঙার ঝন্ঝন্ শব্দে।

ইউ ডার্টি ইণ্ডিয়ান —

তাকে মাটিতে ফেলে দাঁত খিঁচিয়ে বললো বিষ্টু, তেরা বাপকো বোলা আভি শালা —

একটা আধ-বুড়ো ইংরেজ বিষ্টুর কাছে এসে বললো, বিহেভ ইওর সেল্ফ —

চোপ্ রণ্ড গাধ্বীকা বাচ্চা — তেবা মাকো বিহেভ শিখ্লা —

বারমেইড প্রথম কয়েক মিনিট কি করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর কয়েকটা আলো পর পর নিবিয়ে দিয়ে তুলে নিলো টেলিফোনের রিসিভার। সেটা নামিয়ে রাখবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো ছ ফুট লম্বা দুজন সুদর্শন লণ্ডন-পুলিশ। আর মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো। এক মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ হ'লো সে পাব। নেশা ছুটে গেছে সকলের। করুণ চোখে ওরা তাকিয়ে রইলো পুলিশের দিকে।

গুড্ ইভ্নিং, একজন পুলিশ বারমেইডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার ?

বারমেইড বললো, ইণ্ডিয়ানগুলো আগে আমার ইংরেজ খদ্দেরদের গালাগাল করে, তারপর মারামারি ঘুসোঘুসি। এই দেখ না, আমার গেলাস বোতল বাল্‌ব্ ভেঙে কতো ক্ষতি করেছে —

পুলিশ আর একজনকে ইসারা করলো। দরজা খুললো সহকারী। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আর অনেক তুষার-কণা উড়ে এলো ঘরে। দেখা গেল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ভ্যান্। ওয়েল্ জেণ্টেলমেন্ প্লিজ্ — হাত দিয়ে বিনীতভাবে বাইরের গাড়ী দেখালে পুলিশ। অর্থাৎ এবার সেটাতে চ'ড়ে তাকে ধন্য করতে হবে। অনেক ইংরেজ একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, উই ?

অল্ অফ্ ইউ প্লিজ, আরও বিনীতভাবে মৃদু হাসলো অফিসার। কাউকে চোখ রাঙালো না, কাউকে কঠিন কথা বললো না একটিও।

ভ্যানে ব'সে নিশ্চিন্ত হ'লো দীনবন্ধু। এখন আর মন খারাপ ক'রে লাভ নেই। চোখ বুজে দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। কিন্তু কাঁদছিলো রতন।

সি, পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের ক'রে বললো গণেশ, ওল্ড্ রতন ক্রাই লাইক্ লিটিল্ চাইল্ড্, তারপর দেশলাই খুঁজে না পেয়ে পুলিশের গায়ে আস্তে টোকা মেরে বললো, হেলো ওপিচার্, গট ফায়ার্ ?

তার হাতে সিগ্রেট দেখে ব্যাপার বুঝে নিলো পুলিশ। মৃদু হেসে বললো, আই অ্যাম্ অ্যাফ্রেড্ ইউ কাণ্ট্ স্মোক্ ইন দি ভ্যান্ —

থাম্ তুই রত্না, বাচ্চা ছেলে নাকি রে তুই ? সান্ত্বনা দিলো দীনবন্ধু, কতো শালা এসে কতো কি দেখে লণ্ডন শহরে, বর্লি জেল দেখার ভাগ্যি ক'টা লোকের হয় রে ? থাম্ থাম্ —

তুষার-ঝরা সন্ধ্যায় সেই পুলিশ-ভ্যান থানার দিকে ছুটে চললো।

৩

যখন ফিস্ ফিস্ রিম্ ঝিম্ তুষার ঝরে, আর দেখতে দেখতে সাদা হয়ে যায় চারপাশ, তখন কে যেন নিঃশব্দে রতনের মনের নিবিড়ে এসে দাঁড়ায়, সে তার সোনা বউ। ছুটির দিন হ'লে কিছুতেই ঘরে থাকতে পারে না রতন। রেইন্ কোট গায়ে দিয়ে ছোটো ছেলের মত রাস্তায় বেরিয়ে প... আর রেস্তোরাঁয় থাকলে সব কিছু ভুলে বার বার দিশা হারায়।

রাস্তায় বেশী লোক নেই। ছোটো ছেলে মেয়েরা বরফের বল ছোঁড়াছুঁ... করে খেলা করে। নোয়াখালীর মানুষ রতন। তুষার-কণায় সে শে... শেফালীর গন্ধ পায়। আর মনে হয়, কবে তোমার দেখা আমি পাবো সোনা বউ! কালো রঙ্ তার, লম্বা লম্বা চুল, আঁটসাট দেহের বাঁধন আ... টানাটানা চোখ।

একদিন দেশে ফিরে যাবেই রতন। যেমন করে খালাসী হ'য়ে হঠা... চলে এসেছিলো ঠিক তেমনি করেই আবার চলে যাবে। শুধু টাকা করতে ভালভাবে খেয়ে প'রে তার সোনা বউকে নিয়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে বলে ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে এত দূর দেশে এসেছে রতন। ফিরে গিয়ে সোনা বউকে খুঁজে বের করে বাঁধবে সে ঘর।

তুষারের দিনে এমনি অনেক কথা ভাবে রতন। তার অশিক্ষিত মাথায় খেলে নানা কল্পনা। বিদেশের কত আশ্চর্য গল্প সে জমিয়ে রাখতে চায় তার অদেখা সোনা বউএর জন্যে। নিঃশব্দে তুষার ঝরে, সব কিছু চাপা প'ড়ে যায়। শুধু ভেসে ওঠে চোখের সামনে তার সোনা বউ।

রিস্টওয়াচ দেখে সে হিসেব করে দেশে এখন সময় কতো, মাস মনে ক'রে

ভাববার চেষ্টা করে কি ঋতু! আর, হেমন্তের মাঠ ভরা ধান, নীল আকাশ আর পাখিরা তাকে ডাকে, ফিরে আয় ফিরে আয়!

ফিরে যাবে বৈকি রতন — একদিন ফিরে যাবেই।

প্রথমে লণ্ডনে নেমে কান্না পেয়ে গিয়েছিলো তার। এ কোন পাতাল-পুরীতে এলো সে! কয়েকদিন পরই আবার ফিরে যেতে চেয়েছিলো রতন। ঘন কুয়াশায় কাছের আলোগুলিও ঢাকা পড়েছে। দু'হাত দূরের মানুষের মুখ দেখা যায় না। এমন হাতড়ে হাতড়ে চলবে সে কেমন করে!

পরদিন সকালে আরও খারাপ লাগলো রতনের। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। সূর্যের দেখা নেই। বাড়ীগুলির মাথায় চিমনীর ধোঁয়া আকাশ কালো করেছে। এই লণ্ডন, এই বিলেত! এই হতচ্ছাড়া দেশে মানুষ থাকে কেমন করে! তার ওপর কথা বলবার একটিও লোক নেই তার। টাই বেঁধে কোট প্যাণ্ট প'রে রতনের চলতে কষ্ট হয়। হাঁটু অবধি ধুতি তুলে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু যা শীত! সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

তারপর একদিন অল্ডগেটের আস্তানা খুঁজে পেতে খুব বেশী দেরী হ'লো না রতনের। অনেকদিন পর প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরে সে যেন বেঁচে গেল।

তার পিঠে চাপড়ে দীনবন্ধু বললো, থেকে যাও এখানে, দেখবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, কতো রকমের জিনিস আছে এই লণ্ডন শহরে।

কিন্তু জাহাজের চাকরী?

আরে দূর, কে কার খোঁজ রাখে? গা ঢাকা দিলে কেউ ধারও ধারবে না তোমার। এসো একটু বিয়ার খাও দেখি —

মদ খাবো?

সোনার চাঁদ ছেলে আমার! এ কি তোমার নোয়াখালী বাপধন? অমন কথা এখানে বলো না, লোকে শুনলে হাসবে।

বলতে গেলে দীনবন্ধু রতনের লণ্ডনের গুরু। আস্তে আস্তে রতনকে লণ্ডনে বসবাসের উপযুক্ত করে দিলো। আদব কায়দা শেখালো, অনেক উপদেশ দিলো আর সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনের দেখবার জিনিসগুলো দেখিয়ে দিলো।

চারপাশে তাকিয়ে নানারকম ব্যাপার দেখে শুনে প্রায় মাথা খারাপ হ'য়ে গেল রতনের। কাজেই চোখের সামনে থেকে কুয়াশা কেটে যেতে বেশী দেরী হ'লো না। একে একে সব কিছুই আয়ত্ত করে নিলো সে। ভালো ক'রে টাই বাঁধতে শিখলো, রোজ দাড়ি কামানো অভ্যাস করলো, একা একা 'পাবে' গিয়ে মদের অর্ডার দিতে লাগলো, আর অচেনা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবারও সাহস পেল।

খুব শিগগিরই রতনের মনে হ'লো খাশা শহর এই লণ্ডন। এতো আনন্দ আর কোথায়? কেউ চোখ রাঙায় না, কেউ কারুর খোঁজ রাখে না যত ইচ্ছে ফুর্তি করো, কারুর কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। এখানে মরণেও সুখ। তাই থেকে গেল রতন। তবু সঙ্কোচ কাটতে তার বেশ দেরী হয়েছিলো বৈকি! প্রথমে বেশ ভয় হ'তো, অসুবিধা হ'তো। একটা রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের সামনে দিয়ে বৃথাই চার পাঁচবার হাঁটাহাঁটি করতো রতন। কথা বলতে কিছুতেই সাহস করতো না। ও যে মেমসাহেব সে-মনোভাব অনেকদিন তাকে বেশ দমিয়ে রেখেছিল।

একদিন তো রীতিমতো বোকা ব'নে গিয়েছিলো রতন। সেকথা ভাবলে আজও তার হাসি পায়, আর দু'পাউণ্ড জলে যাওয়ার কথা ভুলতে পারে না। সত্যি বিলেতে না এলে বুদ্ধিশুদ্ধি খোলে না মানুষের।

গ্রীণপার্ক টিউব স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে সে-মেয়েটি রতনের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। সাহস ক'রে হঠাৎ রতনও ফেললো হেসে। ইসারা কাজে লেগেছে বুঝে মেয়েটি রতনের কাছে এগিয়ে এসে বললো, হ্যালো ডার্লিং।

কয়েকবার ঢোঁক গিলে অদ্ভুত ইংরেজী উচ্চারণে রতন জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ?

মেয়েটি কিন্তু রতনের উচ্চারণ বুঝতে পারলো। বোধ হয় এই ধরণের লোক আরও দেখেছে সে। হেসে উত্তর দিলো, টেরী।

আমি — আমি ইংরেজী জানি না —

কিছু যায় আসে না, টেরী খুব আস্তে রতনকে বললো, আমার সঙ্গে আসবে নাকি ?

কোথায় ?

আমার ঘরে — খুব কাছেই।

না না, ওই পার্কে চলো —

বেশ রেগে বললো টেরী, তোমার সঙ্গে পার্কে ব'সে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।

ঢোঁক গিলে রতন বললো, আমি টাকা দেবো তোমাকে।

তোমার কাছ থেকে দু'পাউণ্ড নিয়ে পুলিশকে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিতে আমি রাজী নই —

টেরী চ'লে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি তার একটা হাত ধরে রতন বললো, আমি শুধু গল্প করবো তোমার সঙ্গে —

রতনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে টেরী বললো, দু'পাউণ্ড দিতে হবে আমাকে, আর কুড়ি মিনিটের বেশী আমি ব'সতে পারবো না। রাজী ?

হ্যাঁ।

কিছু যদি মনে না করো, দয়া ক'রে টাকাটা এখুনি আমাকে দিয়ে দাও ?

এই তো, টাকা বের করে দিলো রতন।

ধন্যবাদ, পাউণ্ডের দু'খানি নোট ব্যাগে রেখে টেরী রতনের হাত ধ'রে গ্রীণপার্কের ভেতরে নিয়ে চললো। যেন রতনের সঙ্গে তার কতোদিনের পরিচয়! আর ধন্য হ'য়ে গেল রতন। বিলেতে মেমসাহেবের হাত ধরে

চলেছে সে। এমন সৌভাগ্য ক'টা লোকের হয়! আনন্দে তার শরীরে শিহরণ লাগলো। এ সময় একটিও দেশের লোক তাকে দেখলো না কেন!

গ্রীণপার্কে একটা বেঞ্চে ব'সে টেরী দুঃখ প্রকাশ করলো, কেন আমার ঘরে গেলে না? শুধু শুধু পার্কে ব'সে কেউ দু'পাউণ্ড নষ্ট করে?

তোমার ঘরে যেতে আমার ভয় করলো।

কেউ দেখতো না আমাদের, ভয় কিসের?

জানি না।

তুমি পাগল, শুধু এর জন্য দু'পাউণ্ড — টেরী রতনের খুব কাছে সরে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো।

রতনও টেরীকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বললো, তুমি কাল আসবে?

হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি গ্রীণপার্ক টিউব স্টেশনের সামনে দাঁড়াই।

কাল আবার তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবো। ইংরেজী বলতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো রতনের।

বেশ তো, ভারতীয় বন্ধু পেতে আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার বাড়ী কোথায় টেরী?

বাড়ী অনেক দূর, তবে কাছেই আমার ঘর, আমি বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধ্যেবেলা সেখানেই নিয়ে যাই!

কাল আমি তোমার ঘরে যাবো।

আজই যাওয়া উচিত ছিলো তোমার। শুধু এর জন্যে দু'পাউণ্ড —

আর কি কথা বলবে ওরা! চুপ ক'রে কাটলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ রতনকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টেরী, কুড়ি মিনিট হ'য়ে গেছে প্রিয়তম —

আর একটু ব'সো টেরী!

বসতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু বোঝ তো, আমাকে নিজের খরচ চালাবার জন্যে অনেক রোজগার করতে হয়। কাল যদি আসো তাহ'লে আবার দেখা হবে। গুডনাইট ডার্লিং—

গ্রীণপার্কের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল টেরী।

অনেকক্ষণ সেই বেঞ্চে ব'সে রইলো রতন। দূরে রাস্তার আলো জ্বলছে। পার্কে অনেক লোকের ভীড়। অনেকেই মেয়ে-বন্ধু নিয়ে চলেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে রতন ভাবছিলো, কাল টেরীর সঙ্গে নিশ্চয়ই সে যাবে তার ঘরে।

দীনবন্ধু সমস্ত ব্যাপারটা রতনের মুখে শুনে খুব জোরে হেসে উঠলো, গাধা কোথাকার! এ রকম ক'রে পয়সা নষ্ট করে কেউ? ওর ঘরে গেলি না কেন তুই?

ওরে বাবা, শেষে কি বিপদে পড়বো!

বিপদ আবার কি, কড়ি ফেলবি তেল মাখবি।

কাল আবার ও আসবে বলেছে।

কিন্তু এরকম করে পয়সা ওড়ালে না খেতে পেয়ে মরে যাবি যে। আর ওদিকে যাস কেন? ওয়েস্ট এণ্ডে যাওয়া কি তোর আমার পোষায়? বড়লোকের পাড়া ওটা।

তবে কোথায় যাবো?

এদিকেই কতো আছে! আর খুব সস্তা, বুঝলি —

কোথায়, কোথায়? রতন সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলো।

এই অল্ডগেটেই। চাস তো ঠিকানা দেবো আমি। আগে ফোন করে তারপর যাস।

দীনবন্ধুর কথা রাখলো রতন। পরদিন বড়লোকের পাড়ায় টেরীর সঙ্গে দেখা করতে আর গেল না। কিন্তু কয়েকদিন পর একটু ইতস্তত করে দীনবন্ধুকে বললো, সেই যে — বলো না একটা ঠিকানা —

ধমক দিলো দীনবন্ধু, বলি মিঁউ মিঁউ করিস কেন বিলেতে বসে? কি চাস খুলে বল?

মেয়ের ফোন নম্বর।

তাই বল। দুধের বাছা আমার রে, এই কথাটা বলতে লজ্জায় একে-বারে মরে গেলি যে য়ঁ্যা ?

আমি কথা বলতে পারি না ভালো, তুমি ফোন করে বন্দোবস্ত করে দাও —

এক কথায় দীনবন্ধু সব ঠিক করে দিলো। কাছেই বাড়ী সে মেয়ের। নাম বেটি। পাঁচ তলায় ফ্ল্যাট।

দীনবন্ধু বললো, লিফ্‌ট্‌ আছে। তবে অতো হ্যাঙ্গামে তোর দরকার নেই। ঘাবড়ে যাবি। সিঁড়ি দিয়ে সটান ওপরে উঠে ঘণ্টা বাজাবি। রাত্তিরটা থাকবি তো ওখানে ?

হঁ্যা, মাথা নিচু করে বললো রতন।

তিরিশ শিলিং দিবি বেটিকে আর বেশী পয়সা রাখিস না কাছে, শুধু দশ শিলিং-এর একটা নোট।

কেউ খুন টুন করবে না তো ?

এ কি তুই চিৎপুর পেয়েছিস নাকি রে শালা ?

তুমি চল না পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে ?

মারবো এক থাবড়া, গর্জে উঠলো দীনবন্ধু, কচি ছেলে নাকি রে তুই যে আব্দার ধরেছিস ? রইলি লণ্ডনে এতোদিন তবু তোর চোখ ফুটলো না ? যা যা, যা করবার করে দিয়েছি আর বিরক্ত করিস না আমাকে —

রতন আর কিছু বললো না। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠিক রাত্তির দশটার সময় খুঁজে বের করলো সে বাড়ী। ছমছম্ করে উঠলো তার সমস্ত শরীর। সরু গলি। চারপাশ নিস্তব্ধ। তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কয়েকজন গুণ্ডা মার্কা লোক। আর একটু দূরে ঘোরাঘুরি করছে পুলিশ। রতন একবার ভাবলো, কাজ নেই বাবা, ফিরে যাই। বিদেশে বিভুঁয়ে শেষে কি বিপদে পড়বো কে জানে ! কিন্তু না, কি ভাববে তা'হলে দীনবন্ধু ! ফোন করে সব ঠিক করেছে সে। এখন যদি ও ফিরে যায় তাহলে নাম

খারাপ হবে ভারতীয়দের। মেয়েটি ভাববে তাদের কথার ঠিক নেই। এমন অনেক আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে রতন একসময় ঢুকে পড়লো সেই বাড়ীটার ভেতর। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ। তার পায়ের শব্দে চারপাশ যেন বিচলিত হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ আর একজনের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলো রতন। কে যেন ওপর থেকে নেমে আসছে। সর্বনাশ! কেউ যদি এই অন্ধকার ফাঁকা বাড়ীতে গলা টিপে খুন ক'রে ফেলে তাকে, একটি লোকও টের পাবে না। কাল সমস্তদিন বাড়ী না ফিরলে পরশু হয় তো দীনবন্ধু তার খোঁজ করতে পারে, কিন্তু ততক্ষণে রতনের লাস গুণ্ডারা কোথায় চালান ক'রে দিয়েছে কে জানে!

সে মূর্তি রতনের একেবারে কাছে এসে পড়লো। তার চেহারা দেখে মাথা ঘুরে গেল রতনের। ছ'ফুট লম্বা নিগ্রো। সে আবার হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সেই অন্ধকারে কুচকুচে রঙের মাঝে ঝক ঝক করছে তার শাদা দাঁত। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর সে হয়তো বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে রতনের ওপর! লোকটা নিশ্চয়ই মদে চুর। এখন যে আর পালিয়ে যাবারও উপায় নেই। হে মা কালী, রক্ষা করো — রতনের সমস্ত শরীর কাঁপছে।

কিন্তু কিছুই হ'লো না। 'হ্যালো জেন্টেলম্যান, গুড ইভিনিং' বলে সেই নিগ্রো নিচে নেমে গেল। তবু এতো ভয় পেয়েছিলো রতন যে তাকে উত্তরে 'গুড ইভিনিং' বলবারও সাহস পেলোনা। যন্ত্র-চালিতের মতো সে ওপরে উঠতে লাগলো।

কলিং-বেল টেপবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো বেটি। এসো ডার্লিং, তোমারই অপেক্ষা করছি। তুমিই তো ফোন করেছিলে আজ?

হ্যাঁ, সেই শীতেও যেন ঘেমে উঠলো রতন।

এসো, মৃদু হেসে হাত ধরে বেটি রতনকে নিয়ে গেল শোবার ঘরে।

কী সুন্দর সাজানো ঘর! রতন অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এই অল্ডগেটের ভাঙা বাড়ীতে বেটিও তো থাকে কিন্তু তার ঘরের সঙ্গে রতনদের ঘরের কী আকাশপাতাল তফাৎ! ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রোব্, বইয়ের শেলফ, আর কী নরম ঝকঝকে পুরু বিছানা! খাটের কাছেই টেলিফোন। হয়তো অনেক পয়সা বেটির — রতন মনে মনে ভাবলো একবার।

আজও থেকে থেকে তার বেটির কথা মনে হয়। আর সে ভাবে, বিলেতে এসে প্রথম প্রথম কী বোকামিই না করেছে! মেমসাহেব দেখলেই তার ভালো লেগেছে। বাছ বিচার করবার ক্ষমতা ছিলো না। কি-ই বা এমন দেখতে ছিল বেটি! মোটা সোটা বেঁটে গোলগাল। সস্তা রঙ মেখে কাঠের পুতুলের মতো হাত ধরেছিলো তার। তবু তাকে কী ভালোই যে লেগেছিল রতনের!

আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তোমার কাছে আসবো বেটি।

অমন কথা সবাই বলে, হেসে বললো বেটি।

না, আমি সত্যি আসবো, তোমাকে ভালবাসবো — তুমি দেখে নিও —

তোমার মতো অনেক ইণ্ডিয়ান আমাকে বলেছে ওকথা, কিন্তু কেউ আর ফিরে আসে নি। এদেশে কি মেয়ে বন্ধুর অভাব আছে? হয় তো কতো ভালো বন্ধু পেয়েছে তারা।

চাই না আমি অন্য মেয়ে বন্ধু।

অমন কথা সবাই বলে গো সবাই বলে।

মুখ ভার করে রতন বললো, বিশ্বাস না করলে কি করবো বল —

আচ্ছা গো আচ্ছা, রতনের পাশে বসে বললো বেটি, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।

রতন খুশী হ'য়ে বললো, আবার যখন আসবো বল কি আনবো তোমার জন্যে?

ইণ্ডিয়ান পারফিউম্ আছে তোমার কাছে? আমার এক ভারতীয় বন্ধু দিয়েছিল একবার আমাকে — বড় চমৎকার।

পারফিউম্ কি? বোকার মতো রতন জিজ্ঞাসা করলো।

তুমি কি গো? হেসে রতনের গায়ে ঢ'লে প'ড়ে বলেছিল বেটি, পারফিউম্ কি না জেনে এসেছো মেয়ে-বন্ধুর বাড়ী!

রতন লজ্জা পেয়ে বেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। না, ইংরেজীটা ভালো ক'রে না শিখলে কিছুতেই চলবে না এদেশে। বাবুদের ছেলেদের মতো যদি দেশে থাকতে শিখতে পারতো তাহ'লে কত সুবিধা হ'তো তার।

তুমি আমাকে ইংরেজী শেখাবে বেটি?

ওমা, আমার সময় কোথায়? জানো আমার নিজের সমস্ত খরচ নিজে চালাতে হয়? দিনের বেলা চাকরী করি মাংসের দোকানে। তুমি এদেশে থাকবে তো কিছুদিন?

হ্যাঁ।

তবে আর ভাবছো কেন? নিজের থেকেই শিখে নেবে ইংরেজী। যাক্ গে, রাত্তিরে থাকবে তো আজ, অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। টাকা এনেছ তো? দেখ, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা নিতে আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু করবো কি বল, নিজের খরচ নিজে চালাতে হয় যে —

টাকা দেবো তোমাকে এখন?

দয়া ক'রে, যদি কিছু মনে না করো —

রতন পকেট থেকে টাকা বের ক'রে বেটিকে দিলো। বেটি টাকা গুনে নিয়ে তার সামনেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলো। রতন লক্ষ্য করলো বেটি কিন্তু চাবি দিলো না ড্রয়ারে।

এবার ঘুমোনো যাক কি বল?

হাই তুলে রতন বললো, বেশ।

আলো নিবিয়ে দেবো?

না না, অন্ধকারে আমার বড়ো ভয় করে।

গ্যাস্ বন্ধ ক'রে হেসে বললো বেটি, তুমি একটি দুধের বাছা!

রতন হাসলো। ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট।

অনেক রাত্তিরে রতন আর একবার ঘড়ি দেখলো। কিন্তু রাত্তির আর নেই তখন। ঘড়িতে বেজেছে ভোর সাড়ে পাঁচটা। বেটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে। দেখলে মনে হয় না সহজে তার ঘুম ভাঙবে।

এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বুঝতে পারেনি রতন। কী নিঝুম বাড়ী! কখন কি হয় বলা যায় না। পায়ের শব্দে সে চমকে চমকে উঠেছে। আবার যদি সেই নিগ্রোটা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়! এমন ক'রে রাত্তিরে আর কখনও থাকবে না কোন মেয়ের বাড়ী। কোথা থেকে কি বিপদ আসে কে জানে! একটা দুঃস্বপ্নের মতো সেই নিগ্রো পেয়ে বসেছে রতনকে। নাঃ, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

খুব সাবধানে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো রতন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধলো, কোট প্যাণ্ট্ প'রে ওভারকোট গায়ে চাপালো। তারপর বেটির দিকে ভালো ক'রে তাকালো একবার। কিছুতেই জাগবে না সে এখন। খুব আস্তে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুললো রতন। সাবধানে তুলে নিলো সব ক'টি নোট। তারপর ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা খুলে খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। রাস্তায় বেরিয়েই দেখে সেই শীতের ভোরে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পুলিশ। ওভার-কোটের পকেটে রাখা নোটগুলো শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে প্রায় পুলিশের গা ঘেঁষে ভোরের সেই ভরা কুয়াশায় নিমেষে অদৃশ্য হ'লো রতন।

গ্রীণপার্কে জলে যাওয়া দু'পাউণ্ড উদ্ধার ক'রে খুব বাহাদুরী করেছে এমন ভাব নিয়ে গল্পটা সবিস্তারে দীনবন্ধুকে বললো রতন। তারপর

এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন এবার আর আমাকে গাধা বলবে ?

রতন ভেবেছিলো দীনবন্ধু তার পিঠ চাপড়ে বলবে, সাবাস ভাই, এই তো লায়েক হ'য়ে পড়েছিস দেখছি —

কিন্তু দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ঘাবড়ে গেল। গল্প শুনতে শুনতে ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেল দীনবন্ধু। লাল হয়ে গেল তার সমস্ত মুখ।

রতন বুঝতে পারলো না কেন অমন করছে ও, আর কি অন্যায় করেছে সে।

ফেটে পড়লো দীনবন্ধু, ব্লাডি ফুল্ ইস্টুপিড হারামজাদা —

গাল দাও কেন ? জানতে যাচ্ছে কে ?

তোর বাবা, এটা তোর বাবার দেশ, বুঝলি সোয়াইন্ ? একি তোর নোয়াখালী পেয়েছিস তুই ? এসব ছ্যাঁচড়া কাণ্ড এখানে কেউ করে না। আর করলে তার নিস্তার নেই। লণ্ডনের পুলিসকে তুই চিনিস না। বুঝলি, ওরা ম্যাজিক জানে, মন্তর জানে রাস্কেল। এরা তোর গিরিধারী চৌবে তেওয়ারী নয়। ভাবছিস লণ্ডন-পুলিশকে ফাঁকি দিবি তুই ?

আর কখনও এ কাজ করবো না দীনদা —

আরে এ যাত্রা বাঁচ আগে, তারপর পরের কথা। ছি ছি ছি, কি করলি তুই বল তো ! ইণ্ডিয়ানদের নাম খারাপ — কি ভাববে মেয়েটা ইণ্ডিয়ানদের ?

ওখানে আর যাবো না আমি।

তুই না যাস্ আমি তো যাবো, আমি না যাই ছোট্টু তো যাবে, সে না যায় আর কোনো দেশের লোক তো যাবে। ইণ্ডিয়ান দেখলে এখন মেয়েটা তার সঙ্গে কি ব্যবহার করবে বল তো ? ছি ছি ছি —

টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে আসবো গিয়ে ?

থাক্ আর বেশী বুদ্ধি দেখিয়ে কাজ নেই। শোন্ রতনা ভালো কথা বলি তোকে। বিদেশে একটা লোককে দিয়ে লোকে সমস্ত দেশের লোককে

বিচার করে। খুব সাবধানে এখানে চলাফেরা করতে হবে তোকে, না হ'লে ফিরে যা দেশে। দেখিস না, এখানে কেউ ঠকায় কাউকে? রাস্তার মোড়ে কাগজওলা কাগজ রেখে বাড়ী চলে যায়, লোকে ঠিক ঠিক কাগজের দাম রেখে কাগজ তুলে নেয়, বিকেলবেলা কাগজওলা এসে পয়সা পকেটে ভরে। কেউ তুলে নেয় অমনি একটা কাগজ? কিংবা পয়সাগুলো চুরী করে? কেউ এখানে ঠকায় না কাউকে। আর ঠকালে তার নিস্তার নেই — ছ' পেনির বদলে জরিমানা দিতে হয় ছ' পাউণ্ড। ধরা সে পড়েই। লণ্ডন-পুলিশকে ফাঁকি দিতে পারে এমন ঘুঘু জন্মায়নি এখনও —

আমার কি হবে দীনদা? শেষে কি বিদেশে জেলে গিয়ে পচবো? এবারটি আমাকে বাঁচাও। তুমি অনেকদিন আছো এখানে — ইচ্ছে করলে সব পারো। পায়ে পড়ি তোমার — আর কখনও এমন করবো না। যেমন ক'রে হোক আমাকে বাঁচাও। প্রায় কেঁদে ফেললো রতন।

শান্ত হ'য়ে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে দীনবন্ধু, অবশ্য পুলিশে খবর দিয়ে গোলমাল করবে না মেয়েটা। কেননা ও ব্যবসা করবার আইন নেই লণ্ডনে। তবু পাড়ার মেয়ে, পথে ঘাটে দেখা হ'লে কি বলবি তুই? আর গুণ্ডা লাগাতে পারে তো তোর পেছনে — ওদের হাতে অনেক ভাড়াটে লোক থাকে —

আমি অনেকদিন রাস্তায় বেরোবো না, তাহ'লে আমাকে ভুলে যাবে ও।

ইণ্ডিয়ানকে চট্ ক'রে ভুলবে না, ক'টাই বা কালা আদমী আছে এ পাড়ায়।

তাহ'লে?

মর তুই, আমি কি করবো? ইচ্ছে ক'রে বিপদ ডেকে আনলে আমি নিরুপায়! কিন্তু শেষ অবধি কিছুই হ'লো না। হয়তো মেটি ভেবেছিলো নোটগুলি অন্য কোথাও রেখে খুঁজে পাচ্ছে না। রতন যে চুরী করতে পারে সম্ভবত সেকথা সে ভাবতেই পারে নি। অন্তত, এই কথা মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লো রতন।

জাহাজে চাকরী ক'রে জমানো টাকা প্রায় ফুরিয়ে এলো রতনের। এবার এখানে একটা চাকরীর চেষ্টা না করলেই নয়। দীনবন্ধুর কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে রতন নানা জায়গায় চেষ্টা করতে লাগলো।

সেই ঘটনার পর থেকে আর কোন মেয়ের বাড়ী যায় নি রতন। ভয়ে নয়, বিতৃষ্ণায়। নিজের ওপর তার কেমন যেন একটা ঘেন্না ধ'রে গেল। আর অতো খরচ করবার মতো পয়সাও তার নেই। তার চেয়ে, যেমন দীনবন্ধুর মুখে শুনেছে, এমন একজন মেয়ের দেখা যদি পাওয়া যায়, যে অমন ব্যবসা করে না, ভদ্র ঘরের মেয়ে, যে ভালোবাসবে রতনকে আর রতনও যাকে ভালোবাসবে। শুধু পয়সার ঠুনকো সম্পর্ক নয় — সত্যিকার ভালোবাসা। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু উপহার দিলেই চলবে। দরকার হ'লে রতনকে সে-ই দেবে পয়সা। এমন নাকি কতোই হয় লণ্ডন শহরে। সেই রকম একটা ভালো মেয়ে খুঁজে বের করবে রতন। তারপর বিয়ে করবে তাকে। ভাবতেও এতো ভালো লাগে তার! কিন্তু ইংরেজীটা ভালো ক'রে শিখতেই হবে। না হ'লে মেমবউএর সঙ্গে মনের কথা বলবে কেমন করে! অবশ্য বিয়েটা একবার ক'রে ফেলতে পারলে আর তার ভাবনা নেই, বউই তাকে শেখাবে ইংরেজী। যেটা সে বুঝবে না বউ তাকে বুঝিয়ে দেবে সহজেই।

বারবার দুঃখ করে রতন, দেশে থাকতে বাবুদের ছেলেদের মতো ইংরেজীটা কেন শিখলো না। তবু চারপাশে অনেক ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে রতনের মনে হয় এদেশের মেয়ে বিয়ে না করলে কিছুতেই চলবে না তার। দেশের কতো লোক তো মেম বিয়ে করে, রতনই বা করবে না কেন! কোট প্যাণ্ট্ প'রে টাই বেঁধে জুতো মোজা পায়ে দিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে তার নিজেকে ছোটলোক ব'লে মনে হয় না একবারও।

একদিন এই লণ্ডন শহরেই সে তার বউ খুঁজে পাবে — এই মনে ক'রে দিশাহারার মতো ক্ষুধার্ত মন নিয়ে সমস্ত নগর চ'ষে ফেলতে লাগলো রতন। সন্ধ্যেবেলা পাবলিক বারে গিয়ে বিয়ারের গ্লাশ নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো,

কিন্তু কেউ কথা বললো না তার সঙ্গে। মেয়েরা প্রত্যেকেই এসেছে তাদের ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে। যে-মেয়েরা গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে এলো, তারা কেউই যে ভদ্র নয় সেকথা রতন তাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো। আজকাল সে বুঝতে পারে। তবু আশা হারালো না রতন — একদিন না একদিন কোন ভালো মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হবেই।

সুযোগ বুঝে একদিন সাবধান করে দিলো দীনবন্ধু, বেশী বাড়াবাড়ি করিস না, ভদ্র বউ-ঝির গায়ে হাত দিলে পুলিশের হাঙ্গামে পড়বি।

ঘোড়ার ডিম পড়বো, গায়ে হাত দিলে এদের আবার জাত যায় নাকি দীনদা? পার্কে-পার্কে দিনের আলোয় কি কাণ্ড করে দেখ না?

ওরা হ'লো লভার, বুঝলি?

আমিও একটা লভার জুটিয়ে নেবো।

ভুলে যাস না তুই কালা আদমি —

তা'তে ক্ষতিটা কি? সাহস বেড়েছে আজকাল রতনের।

বলি জেলে যাবার সাধ হয়েছে রে?

সব বাজে কথা তোমার, একটু বিরক্ত হয়ে রতন বললো, এখানে কেউ কথায় কথায় পুলিশে খবর দেয় না। —

কদিন আছিস এখানে? চেঁচিয়ে উঠলো দীনবন্ধু, আমি এখানে আছি বারো বছরের বেশী, বলি আমার থেকে বেশী জানিস নাকি রে তুই? শেষে বিপদে পড়ে নাকি কান্না কাঁদলে মারবো এবার লাথি —

রতন উত্তর দিলো না। সব সময় বড় সর্দারি করতে ভালোবাসে দীনবন্ধু। রাগ হয় তার আজকাল।

একদিন দেখা পেলো রতন তার মনের মানুষের। রোদ উঠেছিলো সেদিন। লণ্ডনের ঠাণ্ডা সূর্যের হাল্কা রোদ। হাইড পার্কে বেঞ্চে বসে রতন ছেলেমেয়েদের নৌকো বাওয়া দেখছিলো। চারপাশে প্রায় খালি গায়ে

গড়াগড়ি যাচ্ছে কতো ছেলে মেয়ে। কোথাও একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে গদগদ ভাষায় কি যেন বলে যাচ্ছে। কি বলে ওরা? রতন ভাবে, নিশ্চয়ই প্রেমের কথা। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে রতনের। তার দিকেও অনেকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে।

একটি মেয়ে এসে তার পাশে বসলো। তাড়াতাড়ি একটু সরে গেল রতন। একটু পরে সিগ্রেট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, খাবে? অবাক হ'য়ে মেয়েটি বললো, না ধন্যবাদ।

খাও খাও —

সিগ্রেট নিয়ে মেয়েটি আবার বললো, ধন্যবাদ।

ছাখো, অদ্ভুত ইংরেজীতে রতন বললো, এসেছি তোমাদের দেশে কিন্তু বন্ধু বান্ধব নেই —

রতনের ইংরেজী একবর্ণও না বুঝে বাধা দিয়ে মেয়েটি বললো, পার্ডেন?

মাথা চুলকে ঢোক গিলে বললো রতন, আমি ইংরেজী জানি না। হেসে মেয়েটি চুপ করে সিগ্রেট টানতে লাগলো। একটু পরে আবার বললো রতন, তুমি আমাকে শেখাবে ইংরেজী?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ভারতবর্ষের লোক বুঝি?

হ্যাঁ।

ছাত্র? ফস করে রতন বলে ফেললো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার জন্যে বললো, তুমি আমাকে ইংরেজী শেখালে বড়ো ভালো হয়। এখন তো গ্রীষ্মকাল — পার্কে বসেই তুমি আমাকে শেখাতে পারো —

মেয়েটি কিছু না বুঝে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আজ রাত্তিরে তুমি ডিনার খাবে আমার সঙ্গে?

ধন্যবাদ।

খুশীতে মেয়েটির কাছে স'রে এলো রতন। এতদিন পর সে তার মনের মতো সঙ্গীর দেখা পেয়েছে। সাহসী হ'য়ে সে বললো, তুমি আমার

বন্ধু। মেয়েটি কি বুঝলো কে জানে, সে শুধু বললো, ধন্যবাদ। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, আমার এক ভাই ভারতবর্ষে ছিলো —

ঘাবড়ে গিয়ে রতন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ?

ভারতবর্ষে — তোমাদের দেশে।

না না, মানে কোন ভারতবর্ষে ?

কোন ভারতবর্ষে ? হেসে মেয়েটি বললো, ও তুমি বলতে চাচ্ছো ভারতবর্ষের কোন জায়গায় ?

হ্যাঁ হ্যাঁ —

সে একটা খুব বড় নাম, আমার মনে পড়ছে না —

নোয়াখালী নয় নিশ্চয় ?

পার্ডেন্ ?

জায়গার নাম নোয়াখালী নয় ?

না না, আমার মনে পড়ছে না এখন, উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, আমাকে যেতে হবে এবার —

কিন্তু ডিনার ?

ও হ্যাঁ, একটু সামলে নিয়ে বললো মেয়েটি, ক'টা বেজেছে এখন ?

পাঁচটা।

ধন্যবাদ, তুমি এই বেঞ্চে দয়া ক'রে ব'সে থাকো, আমি সাড়ে সাতটার সময় ফিরে আসবো। ঠিক আছে ?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করলে না তো ?

না না।

বিশেষ কাজের জন্যে আমাকে যেতেই হচ্ছে —

তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা ক'রো।

বেশ। তারপর 'চিয়ারিও' ব'লে মেয়েটি চ'লে গেলো। যতক্ষণ তাকে

দেখা যায় রতন তাকিয়ে রইলো তার দিকে। অনেক দূরে ভীড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেলো। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ঘড়ি দেখলো রতন, তার ফিরে আসতে আর কতো দেরী আছে। ইংরেজের কথার এদিক-ওদিক হবে না নিশ্চয়ই। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় সে ঠিক ফিরে আসবেই। এই জায়গা চিনতে পারবে তো? এই বেঞ্চ, ফুলের গাছ, আর সামনে ওই হ্রদ। সেখানে ছেলেমেয়েরা তখনও নৌকো বাইছে।

বিরহ-যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে কাটিয়ে দিলো রতন আড়াই ঘণ্টা। ঘড়িতে এখন ঠিক সাড়ে সাতটা। উসখুস করতে করতে রতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যত মেয়ে আসে সে ঘাড় উঁচু ক'রে দেখে আর ভাবে ওই বুঝি তার বন্ধু আসছে। আটটা বাজলো — সাড়ে আটটা হলো — ন'টার কাছে এলো ঘড়ির কাঁটা, কিন্তু বন্ধু এলো না।

আশায় বাজ পড়লো রতনের। কথা দিয়ে কথা রাখলো না কেন সে! তার মুখ দেখে সত্যি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো রতন।

হয়তো এতো বড়ো পার্কের এই জায়গার কথা ভুলে গেছে মেয়েটি, কিংবা কোনো বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে তাই আর ফিরে আসতে পারে নি। এখন আবার নতুন ক'রে কা'কে খুঁজে বেড়াবে রতন!

তারপর এমন কতো হয়েছে! কতো মেয়ে আসবো ব'লে আসেনি — কথা দিয়ে কথা রাখেনি। আজ তার সঙ্গে ঘুরে কাল অন্য বন্ধুর কোমর ধ'রে রাস্তায় যেতে যেতে দেখেও দেখেনি তাকে। তাই আলেয়ার পেছনে আর ছোটে না রতন। একটা ক্লান্তি এসেছে তার। যন্ত্রের মতো সে যায় অল্ডগেট থেকে লেস্টার স্কোয়ার — লেস্টার স্কোয়ার থেকে অল্ডগেট। আর কোনও দিকে মন নেই তার, মন দেবার সময়ও নেই।

আর একদিনও বিলেতে থাকতে চায় না রতন — মেম বিয়ে করবার

স্বপ্নও দেখে না। শুধু কোন রকমে দেশে ফিরে যেতে চায়। তুষার কণাগুলি বয়ে আনে শেফালীর গন্ধ, আর নিঃশব্দে মনের নিবিড়ে এসে দাঁড়ায় সোনা বউ। অনেক ঘুরেছে রতন — অনেক দেখেছে। কিন্তু তার সোনা বউএর পায়ের কাছেও লাগে না কেউ।

রতনের সোনা বউ। কালো রঙ তার, লম্বা লম্বা চুল, আঁটসাট দেহের বাঁধন আর টানা টানা চোখ।

ফিস্ ফিস্ রিম্ ঝিম্, তুষার ঝরে।

৪

মাঝে মাঝে আইলীনকে নিয়ে বাইরে বেরোয় ভূপাল। সারাদিন এক জায়গায় ঠায় ব'সে থাকতে ভালো লাগে না তার। হিসেব-নিকেশ আর গ্রীলের বাকি কাজ অন্য কারুর ওপর কিছুক্ষণের জন্যে চাপিয়ে দিয়ে ডাকে, এসো আইলীন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হ'য়ে নেয় আইলীন। আয়নায় মুখ দেখে' পাউডার ঘ'ষে আবার নতুন ক'রে লিপস্টিক লাগায়। তারপর ওভারকোট হাতে ঝুলিয়ে, হ্যাণ্ডব্যাগ তুলে নিয়ে ভূপালের সামনে এসে বলে, আই অ্যাম্ রেডি। ভূপাল তাকে সাহায্য করে ওভারকোট পরে নিতে।

সেজেগুজে রাস্তায় বেরোলে আইলীনকে দেখলে কে বলবে যে সে রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস্। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, নকল মুক্তোর মালা গলায়, হাতে রিস্টওয়াচ, পরিচ্ছন্ন সোনালী চুল। দেখতে ভালোই আইলীন।

সকলের সামনে দিয়েই তার হাত ধ'রে বেরিয়ে যায় ভূপাল। লাঞ্চের সময় বেরোলে পিকাডিলির কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় যায় তারা। কারণ দাম বেশী ব'লে সেখানে 'কিউ'এর বালাই নেই। অল্প কয়েকজন খদ্দেরের ভীড়। 'মেনু' হাতে দিয়ে স্মিত হেসে ওয়েট্রেস ওদের অর্ডারের অপেক্ষা করে।

বলো কি খাবে ভূপাল? আইলীন 'মেনু' বাড়িয়ে দেয় ভূপালকে।

আমার দেখবার দরকার নেই, তুমি যা খাবে আমিও তাই।

হেসে আইলীন বলে ওয়েট্রেসকে, টু রোস্ট্ বীফ্স্ প্লিজ —

তারপর সে চ'লে গেলে ভূপালের দিকে তাকিয়ে বলে, এখানে আসো

কেন? এতো বেশী দাম খাবারের! লায়নস্ কর্ণার হাউসে গেলে অনেক সস্তায় দু'জনের খাওয়া হ'য়ে যায়।

ও বাবা, যা লম্বা 'কিউ' ওখানে, অতক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

'কিউ'এ দাঁড়াতে ভালো লাগে না তোমার?

একটুও না।

আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে।

তাই নাকি? ভূপালের মুখ দেখে মনে হ'লো সে বেশ অবাক হয়েছে। তবু বললো, আর লায়নস্ কর্ণার হাউসে 'কিউ'এ দাঁড়িয়েই বা লাভ কি বল? ভেতরে গেলেও যা ভীড় সেখানে, তোমার সঙ্গে শান্তিতে কথা বলতে পারি একটাও?

কি কথা ভূপাল বলতে চায় আইলীন ভেবে পায় না। কেননা এই নির্জন রেস্তোরাঁয় ব'সে অনেক সুযোগ পেয়েও অন্য কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না ভূপাল। খেতে খেতে শুধু বলে, কেমন হয়েছে? ভালো লাগছে? আর কিছু চাই? একটা আইসক্রীম? চা না কাফি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই খাবারেরই নানা আলোচনা।

একদিন কথায় কথায় বললো ভূপাল, জানো আইলীন আমাদের দেশে কেউ কাঁটা চামচ ব্যবহার করে না।

সে কি? তাহ'লে খায় কি ক'রে?

হাত দিয়ে।

বল কি? অবাক হ'য়ে বললো আইলীন, সত্যি?

বললুম তো হ্যাঁ।

আশ্চর্য দেশ তোমাদের, অদ্ভুত নিয়ম-কানুন কিন্তু। আমি যে ভাবতেই পারি না ওকথা।

আমিও ভাবতে পারি না আজকাল, ভূপাল আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

খাবার পর বিল্ দেবার সময় বাধে দু'জনের গণ্ডগোল। দেখি কত হয়েছে, ব'লে আইলীন ঝুঁকে পড়ে বিলের দিকে। ভূপাল ধাঁ করে সেটা সরিয়ে নিয়ে বলে, না, দেখতে হবে না তোমাকে। রেগে গিয়ে বলে আইলীন, রোজ রোজ তুমি দিতে পারবে না আমার খাবারের দাম, আমারটা আমি দেবো।

আমি নেমন্তন্ন করেছি না তোমাকে ?

তাতে কি হয়েছে ?

ছেলে সঙ্গে থাকলে মেয়ে কখনও বিলের পয়সা দেয় না।

নিশ্চয়ই দেয়, আইলিন ব্যাগ খুলে সত্যি পয়সা বের করতে যায়। বাধা দিয়ে বেশ গম্ভীর হ'য়ে বলে ভূপাল, আমাকে পয়সা দেখাতে যেওনা আইলীন — জানো না আমার অনেক পয়সা ? একথা শোনার পর আইলীন আর কিছু বলে না। অবাক হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে। ভাবে, হয় তো ভারতীয়দের ওটাই রীতি — নিজের পয়সা আছে জাহির করা দোষের নয় মোটেই ওদের কাছে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যেবেলা ওরা সিনেমা থিয়েটার ব্যালে কিংবা অপেরা দেখতে যায়। আইলীনের হাত নিজের মুঠোয় ধ'রে চুপ করে বসে থাকে ভূপাল — কথা বলে না। থেকে থেকে আইলীন সিগ্রেট বের করে খায়, তারই ধোঁয়ায় চোখে জল আসে ভূপালের। সরি, আইলীন হাত দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ধোঁয়া। থাক থাক ঠিক আছে, বুকপকেট থেকে রুমাল বের ক'রে আবার কাশে ভূপাল। বিড়ি সিগ্রেট সে খায়নি কোনদিন।

রাস্তায় বেরিয়ে আইলীন্ বলে, তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

চলো, পাবে যাই ?

কিন্তু তুমি যে মদ খাও না।

কিছু যায় আসে না, আমি অন্য কিছু খাবো। আইলীনের হাত ধরে

সামনের বড়ো পাবের সেলুন লাউঞ্জে গিয়ে ঢোকে ভূপাল। অনেক লোক সেখানে। কিন্তু কেউ ফিরেও দেখলো না তাদের দিকে।

পিকাডিলির ঝকঝকে সাজানো 'পাব' ভ'রে উঠেছে নরনারীর কলগুঞ্জনে। কতো ছেলে, কতো মেয়ে! ব'সে থাকো রাত্তির এগারোটা অবধি, যত খুশি মনের কথা বলো, বাধা দেবে না কেউ।

আইলীনের জন্যে জিন্ আর লাইম আর নিজের জন্যে শুধু লেমন স্কোয়াশ নিয়ে ভূপাল ব'সে পড়লো। মদ একেবারেই খায় না সে। আইলীন হেসে বললো, তেষ্টা পেলে তোমাদের দেশে লোকে ঠাণ্ডা জল খায় না?

হ্যাঁ, দেখ না আমার দোকানে ইণ্ডিয়ান খদ্দেরবা গ্লাস অফ ওয়াটার চেয়ে চেয়ে অস্থির করে তোলে তোমাকে।

উঃ, ঠাণ্ডা কাঁচা জল তোমরা খাও কেমন করে!

রেডিয়োয় খুব আস্তে বাজনা বাজছে, আর শোনা যাচ্ছে গেলাসের টুং টাং শব্দ আর কতো কণ্ঠস্বর। চুক চুক ক'রে লেমন স্কোয়াশ খেতে খেতে হঠাৎ কি খেয়াল হ'লো ভূপালের, আইলীনের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো, একটা কথা আজও তোমাকে আমার বলা হয়নি আইলীন।

কি কথা?

এখন বলবো?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আমাকে তোমার ভয় কি ভূপাল? ভূপাল কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর আইলীনের হাত চেপে ধ'রে ফস্ ক'রে বলে ফেললো, আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে আইলীন।

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললো আইলীন, কবে থেকে জানি আমি সেকথা।

জানতে তুমি? বিস্ময়ে চোখ বড়ো হ'লো ভূপালের।

হ্যাঁ, বহুদিন।

কেমন ক'রে ? আমি কি বলেছিলাম তোমায় ?

না গো।

তবে কেমন ক'রে জানলে তুমি ?

সেকথা বলতে পারবো না।

দয়া ক'রে বলতেই হবে তোমাকে, আইলীনের হাত শক্ত ক'রে ধরে মিনতি করলো ভূপাল।

কিন্তু আমি যে তাকে কথা দিয়েছি —

হুঁ, গম্ভীর হ'য়ে বললো ভূপাল, আর বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

বল তো কে ?

রতন।

হ্যাঁ, হেসে বললো আইলীন, ওকে ব'লো না একথা, ও আমাকে বিশ্বাস করে ভূপাল।

না বলবো না, খুব গম্ভীর গলায় বললো ভূপাল, আমাব চাকরেব সঙ্গে কি আমি মারামারি করবো তোমাকে নিয়ে ?

স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে বললো আইলীন, কিন্তু আমিও যে তোমার চাকরানী সেকথা ভুলে যেও না।

লজ্জিত হ'য়ে তাডাতাড়ি বললো ভূপাল, আমাকে মাপ কব, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

তোমার স্ত্রী কোথায় এখন ?

বাংলা দেশে।

তুমি এখনও তাকে ভালোবাসো ?

হ্যাঁ — না —

তাকে আনাও না কেন এখানে ?

লিখেছি তো, কিন্তু এদেশে আমাদের দেশের মেয়েদের অসুবিধা অনেক।

তোমাদের দেশে তো খুব গরম ?

হ্যাঁ।

ছেলেমেয়ে আছে তোমার ?

একটু লজ্জিত হ'য়ে ভূপাল বললো, ছ'টি মেয়ে তিনটি ছেলে।

ও বাবা, হাসলো আইলীন, পাঁচ সন্তানের বাপ তুমি। একটু থেমে আবার বললো, তাদের জন্যে মন খারাপ করে না তোমার ?

প্রথম প্রথম করতো, এখন আর করে না।

কবে ফিরবে দেশে ?

হয়তো আর ফিরবো না।

কেন ?

ফস্ ক'রে মিথ্যা কথা বললো ভূপাল, স্ত্রী ভালোবাসেনা আমাকে, কার কাছে যাবো !

তবে তাকে ডিভোর্স কর না কেন ?

ভূপাল হাসলো। উত্তর দিতে পারলো না কিংবা ইচ্ছে ক'রেই দিলো না, কে জানে। আর ঠিক সেই সময় বারমেইড চেঁচিয়ে উঠলো, লাস্ট্ অর্ডার — লাস্ট্ অর্ডার প্লিজ্ —

তিনদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত বরফ পড়বার পর আজ সকাল থেকে সবে বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ঝির ঝির টিপটিপ ক'রে সুরু হয়েছে বৃষ্টি। কখনও থামে কখনও ঝরে। রাস্তায় ঝরা তুষার শাদা কাদার মতো জ'মে উঠেছে। গাড়ী চললে চাকা বসে যায়, হাঁটতে গেলে সাবধান হ'তে হয়, একটু অসাবধান হ'লেই পা পিছলে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। গাড়ীর চাকার ময়লায় আর মানুষের জুতোর চাপে সেই শুভ্র জমাট তুষার মলিন হ'য়ে উঠেছে।

ভারী ওভারকোট আর বুট প'রে চৌধুরী প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ইণ্ডিয়া গ্রীলের সামনে এসে দাঁড়ালো। বৃষ্টি অথবা তুষারের দিনেও কেন্ট

কখনও পরে না চৌধুরী। কেননা হাওয়ায় তার মাথা থেকে টুপী উড়ে যায় আর পথিকের সামনে লজ্জায় পড়তে হয় তাকে।

ইণ্ডিয়া গ্রীলে তখন সুরু হয়েছে লাঞ্চ টাইম। অনেক খদ্দেরের ভীড়। দিশি খাবারের তেজী গন্ধ লণ্ডনের লেস্টার স্কোয়ারেও নাকে এসে লাগছে।

দরজা ঠেলে পাপোষে ভালো ক'রে বরফ ঝেড়ে চৌধুরী এসে দাঁড়ালো ভূপালের সামনে। বড়ো ব্যস্ত তখন ভূপাল। রতন নেই, তাকেও মেনু হাতে নিয়ে ছুটোছুটী করতে হচ্ছে বার বার, আর থেকে থেকে ক্যাশের কাছ থেকে কিচেনের দিকে মুখ নামিয়ে চেঁচাতে হচ্ছে, থ্রি ল্যাম্ব্ কারিস্ এণ্ড্ ফোর্ রাইস্ প্লিজ্। চৌধুরীকে খদ্দের মনে ক'রে সে বললো, সিট্ ডাউন স্যার।

আমি আসছি রতনের বাড়ী থেকে।

ও রতন, আচ্ছা তার ব্যাপারটা কি? বলা নেই কওয়া নেই স্রেফ্ ডুব। একটু বরফ পড়লে যদি এ রকম কামাই করে তাহ'লে আমি সামলাই কেমন ক'রে বলুন তো?

বরফ পড়বার জন্যে নয়, বেশ আস্তে বললো চৌধুরী, আমি ভালো ক'রে সব জানি না, পাড়ার একটা লোকের কাছ থেকে শুনলাম — থামলো চৌধুরী।

আহা ঢোঁক গিলছেন কেন, বলুন না ছাই!

ওদের পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে।

পুলিশ! চোখ বড়ো ক'রে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ভূপাল, বলেন কি মশাই!

চৌধুরী যেমন শুনেছিলো, সমস্ত ঘটনা বললো ভূপালকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এখন কি করি বলুন, একটা কিছু তো করতে হবে আমাদের?

আমি কি করবো, আর সময়ই বা কোথায় আমার? ইডিয়ট এক একটা, এতোদিন রইলো লণ্ডনে অথচ এখনও শিখলো না কিছু —

তাহ'লে কি করি আমি?

একটু ভেবে ভূপাল বললো, আচ্ছা, সী-মেন্ আছে কেউ ওদের মধ্যে ?

হ্যাঁ বিষ্টু বেচ্চো মুন্দ শিবে —

ব্যাস্ ব্যাস্ ওতেই হবে, আর ভাবনা নেই। এক কাজ করুন, ইণ্ডিয়া হাউসে কর্তাদের গিয়ে বলুন, ওরা যা হয় বন্দোবস্ত ক'রে দেবে।

ইণ্ডিয়া হাউসেই তো চাকরী করে দীনবন্ধু।

আরো ভালো তাহ'লে। কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনার, ওরাই নিয়ে নেবে সব ভার ওদের। কিন্তু আমিও ছাই যে মুস্কিলে পড়লাম এখন, রতনের সব কাজ পড়েছে ঘাড়ে —

আপনিও দয়া ক'রে চলুন না আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসে। বড়ো ভালো হয় তাহ'লে, আমি একা একা কি বলতে কি বলবো —

দেখছেন আমার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই — কিচেনের ঘণ্টা শুনে ছুটে গেল ভূপাল। খ্রি ল্যাম্ব্ কারিস্ এণ্ড্ কোর্ রাইস্ তৈরী হ'লো এতোক্ষণে।

চৌধুরী বেরিয়ে যেতে আইলীনকে ভূপাল বললো, শুনেছ রতনের কাণ্ড ?

কি হয়েছে ?

পুলিশ ধরেছে যে ওকে —

সে কি ? কি করলো ও ?

মাতাল হ'য়ে মারামারি করেছে —

রতন মাতাল হয় না কখনও।

বড় দরদ যে রতনের ওপর —

ঠিক ক'রে বল কি ব্যাপার ?

আমি কি মিথ্যা কথা বলছি ?

তুমিই জানো।

সত্যি বলছি পুলিশ ধরেছে ওকে।

ফিরে আসুক ওর মুখেই আসল গল্প শুনবো।

কিন্তু ওকে আমি আর কাজ দেবো না এখানে, রেস্তোরাঁর নাম খারাপ হবে তাহ'লে।

দিও না, ফিক্ ক'রে একটু হেসে বললো আইলীন, আমিও তাহ'লে কাজ ছেড়ে দেবো তোমার —

আইলীনকে অনেক সময় বুঝতে পারে না ভূপাল। তবে কি সত্যিই রতনের ওপর তার দুর্বলতা আছে? কে জানে, কে বুঝবে ইংরেজ মেয়ের মন!

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ভূপালের, আর সে দেখলো পাশে নেই আইলীন। অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু ফিরে এলো না সে। ভাবনায় পড়লো ভূপাল, আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসলো। গেল কোথায় আইলীন? বোধহয় চ'লে গেছে তাকে ছেড়ে। ইংরেজ মেয়ে তো — দয়া মায়া আছে নাকি তাদের! সব পারে ওরা। খুব শিক্ষা হ'লো ভূপালের। আসলে ভুল করেছে সে নিজে। ক'দিন থেকে সে লক্ষ্য করেছে কিছু একটা হয়েছিলো আইলীনের। হয়তো তার বিয়ে হয়েছে শুনে রেগে গিয়েছিলো। নাকি পাঁচ সন্তানের বাপ জেনে তাকে ছাড়বার মৎলব করেছিলো। কি দরকার ছিলো অতো কথা খুলে বলবার? প্রথম থেকে বললেই পারতো, স্ত্রী আছে বটে আমার, তবে সম্পর্ক নেই আমাদের কোনো, তাই তো আমি বিরক্ত হ'য়ে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছি এখানে। এই কথাগুলো শুনলে কতো খুশী হ'তো আইলীন। ইংরেজ মেয়ের তা'তে এসে যেতোনা কিছুই। থেকে থেকে বড়ো বোকামি করে ভূপাল। এতোদিন বিদেশে ব্যবসায় হাত পাকিয়ে এতো টাকা করলো, অথচ একটা অল্প বয়সী মেয়ের সঙ্গে একটু মগজের বুদ্ধি খরচ ক'রে কেমন ক'রে কথা বলতে হয় তাই শিখলো না এখনও। শুধু শুধু সাধু সাজতে গিয়ে অমন সুন্দরী মেয়েটাকে হারালো।

হঠাৎ তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বৃজমের ওপর। তার কি মাথা ব্যথা হ'য়েছিল বাহাদুরী ক'রে ভূপালের হাঁড়ির খবর আইলীনকে দেবার? হোক্ বেটার জেল — দশ বছরের জেল। ভূপাল সব চেয়ে বেশী খুশী হবে তাহ'লে।

সে আর খাটে ব'সে থাকতে পারলো না। উঠে আলোর স্যুইচ্ টিপলো। কোন চিঠিপত্র রেখে গেছে নাকি আইলীন টেবিলের ওপর? না। তার কাপড় জামা জিনিস সবই তো রয়েছে যেমনকার তেমন। তবে ব্যাপারটা কি? ওপরে রেস্তোরাঁয় আলো জ্বলছে যেন। দেখাই যাক্ না ওপরে গিয়ে। হয়তো কেউ নেই। বেরিয়ে যাবার সময় আলো নেবাতে ভুলে গেছে আইলীন। তবু ড্রেসিংগাউন প'রে পা টিপে টিপে সটান ওপরে উঠে এলো ভূপাল। আর তখুনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। একটু দূরে ব'সে প্লেট সামনে নিয়ে হাত দিয়ে খাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আইলীন, আর খাবারে হাত দিতেই বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে তার মুখ।

আইলীন, আনন্দে চীৎকার ক'রে ডাকলো ভূপাল। চমকে উঠে ভূপালকে দেখতে পেয়ে আইলীন বললো, কেন এলে তুমি এখানে — কেন দেখলে আমাকে —

তার কাছে এগিয়ে এসে ভূপাল বললো, তোমাকে ছেড়ে কোনদিনও আমি দেশে ফিরে যাবো না — আজ থেকে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই আইলীন!

ভুল উচ্চারণে অনর্গল ভুল ইংরেজী বললেও ভূপালের মনের ভাব আইলীন স্পষ্ট বুঝতে পারে। আজও পারলো। সে মাথা রাখলো ভূপালের বুকে।

রাত কতো কে জানে। কেননা সেই ঘরের ঘড়ির ওপর পড়েছে অন্ধকার। কিছুতেই কাঁটা দেখা যাচ্ছে না।

৫

ইণ্ডিয়া হাউসে খুব বেশী দেরী হয়নি চৌধুরীর। সেখানকার এক বাঙালী চাকুরের কাছে সে খুলে বলেছে সমস্ত ব্যাপার। বাঙালী বাবু আশ্বাস দিয়েছেন। কাজেই বিচলিত হবার কিছু নেই। শিগগিরই ফিরে আসবে ওরা।

ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক মিনিট হেঁটে চৌধুরী এসে দাঁড়ালো ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর। বেলা তিনটেও বাজেনি তখন কিন্তু প্রায় অন্ধকার হ'য়ে গেছে ম্লান ফ্যাকাশে আকাশ। বৃষ্টি পড়ছে না আর — বরফও বন্ধ। তবু ভারী ঠাণ্ডায় হিম হ'য়ে যায় দেহ। টেমস-এর হাওয়া পুরু গরম জামা ভেদ ক'রেও গায়ে যেন তীর বিঁধিয়ে দেয়।

নদীর এপাশে-ওপাশে অনেক ছোট-বড়ো আপিস। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। পোলের তলায় নদীর পাশের রাস্তার নাম ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট্। অনেকদূরে আর একটা ব্রিজ্ দেখা যায়, চৌধুরী জানে তার নাম, ব্ল্যাকফ্রায়ারস্ ব্রিজ। আর তারও পরে, সেটা দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু চৌধুরী জানে, আছে লণ্ডন ব্রিজ। ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস্ যাচ্ছে, গাড়ী যাচ্ছে, কিন্তু হাওয়ার এতো জোর যে চৌধুরীর মনে হচ্ছে সবই চলেছে ব্রিজের তলায় ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে। টেমস্ নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় তার মনে হয়, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। কিন্তু সাঁতার জানে সে, তাই নিস্তরঙ্গ টেমস্-এ ঝাঁপ দিলেও মরবে না। তবু মরতে সাধ হয় তার।

হয়তো আর কোনদিনও দেশে ফিরে যাবে না চৌধুরী। ফিরবে না

ব'লেই অনিশ্চিতের ওপর ভর ক'রে সাত হাজার মাইল দূরে চ'লে এসেছে সে। দেশে আর তার কোনই আকর্ষণ নেই।

চৌধুরীর বাড়ী জলপাইগুড়ি। আমবাগানের কাছে ছিল তার মনিহারী দোকান। ছেলেবয়সে বিয়ে হ'য়েছিলো তার। নোলক পরা ছেলেমানুষ বউ মালতী ভালো করে কথা বলতে পারতো না। লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতো।

বউ গেল বাপের বাড়ী মাসখানেকের জন্য। মালতীর বাপের বাড়ী ডেঙ্গুয়াঝোড়া, জলপাইগুড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। ফিরে এসে এক রাত্তিরে চৌধুরীর পায়ের ওপর প'ড়ে বললো, বাবা মা তোমারে বলতে মানা করছে, কিন্তু না ক'য়ে থাকতে পারি নাকি আমি গো?

আ: কাঁদ কেন, কি কথা বল?

মাপ করবা কও, সত্যি কইছি কোন দোষ নাই আমার —

ওঠ ওঠ, হইছে কি কও?

একটু থেমে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে মালতী বললো, হাত ধরছিলো শুধু আমার একটা, কালীর দিব্যি আর কিছু করে নাই —

কেটা হাত ধরছিল?

সেই লোকটা —

খোলসা কইরা কও, খুন করুম আমি —

কারে — আমারে?

এইবার চৌধুরী বজ্রমূর্তিতে মালতীকে তুলে ধ'রে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো, কারে দিয়া হাত ধরাইছিলা কও?

আমি ধরামু কেন? শুকনো ভাঙা গলায় ব'লেছিলো মালতী, জল ল'য়ে ফেরার পথে খপ কইর‍্যা আমার হাত টাইন্যা ধরলো —

থামো, কে সে কও?

আমি জানি না, কখনও দেখি নাই তারে। ইয়া বড়ো বড়ো গোঁফ তার।

তোমার বাপ জানে একথা ?

হ, জানে।

তবে আবার তোমারে পাঠালো যে আমার ঘরে ?

অবাক হ'য়ে মালতী জিজ্ঞেস করেছিলো, কি কও তুমি ?

মুখ দেখতে চাই না তোমার।

মাপ করবা না তুমি ?

বেশ্যারে ল'য়ে ঘর করবো কেমনে ?

শাদা হ'য়ে গিয়েছিলো মালতীর মুখ। কাঁপতে কাঁপতে সে শুধু বলেছিলো, এত বড়ো কথা কও তুমি — কি দোষ আমার তাই কও ?

এর পরেও কও দোষ নাই ?

কোথায় যাবো আমি তবে ?

যেখানে খুশী। আমার ঘরে তোমার আর থাকা চলবো না, পষ্ট কয়ে দিলাম আমি।

কোথায় থাকবো তাই কও ?

সরম নাই তোমার ? যারে দিয়ে হাত ধরাইছিলা তার কাছে যাও। তারে না পাও কড়লা নদীতে যাও —

বন্যার বেগে সে-রাত্তিরে কড়লা ভয়ঙ্কর। মালতী সত্যিই সেখানে গেল। আর ফিরে এলো না। উদ্দাম নদী বুকে ব'য়ে নিয়ে গেল তাকে — কেউ জানে না কোথায়।

ভালোই হ'লো। বড় খুঁতখুঁতে চৌধুরী। তাকে নিয়ে কিছুতেই আর ঘর করতে পারতো না। যাকে স্পর্শ করেছে অন্য পুরুষ তাকে সতী বলে আর কেমন ক'রে সে ভালোবাসবে ? কিন্তু তারপর গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে অনেকবার ঘুম ভেঙে গেছে চৌধুরীর। এ আওয়াজের কথা জানে সে। কয়েক মিনিট পর পর অমনি তোপের মতো শব্দ হয় তিস্তা নদীর মধ্যে থেকে। কেউ জানে না কেন হয় সে-আওয়াজ। সে-শব্দ শুনে চমকে ওঠে চৌধুরী।

তবে কি মালতী তিস্তায় ডুবেছিলো ?

কিন্তু তাকে ভুলতে পারলোনা চৌধুরী — কিছুতেই না। আওয়াজ আর মালতীর স্মৃতি তাকে ঘুমহীন ক'রে তুললো। দেশ ছেড়ে পালাতে চাইলো সে। মালতীকে ভোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। অনেকবার এই কথা উচ্চারণ করলো, তারা তারা, শক্তি দাও — শক্তি দাও!

ডেপুটি কমিশনারের ছেলে চাকরী করতো নৌ-বিভাগে। তাকে ধ'রে জাহাজে স্টোকারের চাকরী পেলো চৌধুরী, আর তারপরেই মনিহারী দোকান বেচে দিয়ে দেশ ছাড়লো। কিন্তু মাঝে মাঝে দুঃখ করে চৌধুরী। কেন এমনি ক'রে বিলেতে এলো সে! যদি দেশে প'ড়ে থাকতো তাহ'লে হয় তো এতোদিনে মালতীকে ভুলে যেতে পারতো। একটা মেয়েকে লোকে আর কতোদিন মনে রাখতে পারে? কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে মানুষের মন যে বদলে যায়। বিদেশে কী পরিবর্তন তার হয়েছে! সে যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে। তাই আজ তার নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হয়। দিনে দিনে বয়স বাড়ে কিন্তু দেশ ছেড়ে না বেরিয়ে পড়লে মন বাড়ে না। কথাটা দেরীতে বুঝলো চৌধুরী। তাই থেকে থেকে মালতীর জন্যে আজ সে কাঁদে।

টেমস্‌এর ওপর দাঁড়িয়ে এতো কথা ভাবতে পারছে চৌধুরী, কিন্তু এ নদীর নাম যদি টেমস্ না হ'য়ে করলা হ'তো আর শহরের নাম যদি লণ্ডন না হ'য়ে জলপাইগুড়ি হ'তো তাহ'লে এতো কথা ভেবে এমনি ক'রে বোধ হয় চৌধুরীকে অশান্তিতে জ্বলতে হ'তো না। নিজের দেশে যে-সংস্কার তাকে নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিলো, আজ বিদেশে তার কথা ভাবলে তার বুকে ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। তাই চৌধুরী ভুললো শুধু তার অন্ধ সংস্কারকে আর যাকে ভুলবো ব'লে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো সেই তাকে পেয়ে বসলো!

কিন্তু কেউ জানে না এ কাহিনী। এ হ'লো চৌধুরীর একান্ত আপনার কথা। তার দেশের লোক জানে মালতী ডুবে মরেছে। কেন? সে-সম্বন্ধে তারা নানা কথা বলে। আর তার জন্যেই তো ঘরছাড়া দেশছাড়া চৌধুরী।

স্টীমারের বাঁশীর শব্দে ধ্যান ভাঙলো চৌধুরীর। সত্যি সে লণ্ডনের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে টেমস্ নদী দেখছে। বিগ্ বেনে বেজেছে ঠিক সাড়ে তিনটে। ঝির ঝির ক'রে সুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধরতে পারে। শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে স্ট্র্যাণ্ডে এসে সে পনেরো নম্বর বাস্ ধরলো।

চৌধুরী বাড়ী পৌছতে না পৌছতেই আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। লণ্ডনের প্রকৃতির মেজাজ বোঝে কার সাধ্য? কখন কি মূর্তি ধরে বোঝা কঠিন। দরজা খুলে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলো সে।

সেই মারামারির পর রাস্তায় চলবার উপায় নেই চৌধুরীর এ পাড়ায়। ভারতীয় ব'লে প্রত্যেকটি লোক হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না তাকে। চৌধুরী অবশ্য তাকায় না কারুর দিকে, কাজ সেরেই কোন রকমে বাড়ী পালিয়ে আসে। কাজ না থাকলে রাস্তায় বার হয় না সে, বেড়াতেও ইচ্ছে করে না তার আজকাল। যা কিছু দেখার সব দেখা হ'য়ে গেছে। আর তার বড়ো ভয় পাছে দেশের চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়ে, কেননা তার সঙ্গে তখন অনেকেই জাহাজে চাকরী নেবার চেষ্টা করেছিলো। তাদের কানে যদি সেকথা যায় তাহ'লে লজ্জায় ম'রে যাবে চৌধুরী। বিলেতে ব'সে অতীতের কথা নিজেরই যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তার। কেমন মানুষ ছিলো সে তখন। মানুষ বলে নাকি তাকে!

কোন কাজ নেই ব'লে সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর। তাই ইচ্ছে না থাকলেও বাইরে যেতেই হয় তাকে। র‍্যাশন্ আনা, বাজার করা, লণ্ড্রিতে কাপড় দেয়া নেয়া — এসব তাকেই করতে হয়। এদের দেখা পেয়ে খুশী হয়েছে চৌধুরী। প্রত্যেককেই তার ভালো লাগে। যদি এদের দেখা না পেতো তাহ'লে হয়তো এতোদিনে মাথা খারাপ হ'য়ে যেতো তার। জাহাজের কাজ সে করতে পারলো না বেশীদিন। কেবলই

মনে হ'তো, এ কাজ ব্রাহ্মণের নয় — অস্বস্তি বোধ হ'তো। তাই জাহাজ ছেড়ে পালালো একদিন চৌধুরী। সেই জাহাজে গণেশও ছিলো, আর গণেশের বন্ধু রতন। গণেশ চৌধুরীকে নিয়ে এলো এখানে। তারপর থেকে নিশ্চিন্ত হ'লো সে।

লণ্ডনে মাত্র একটি মেয়েকে চেনে চৌধুরী। তার নাম এলসী। সে সপ্তাহে একদিন এসে এদের এই নোংরা বাড়ী পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে। ঘণ্টা দুয়েক থাকে সে। মাইনে নেয় সপ্তাহে পাচ শিলিং। তার সঙ্গেই শুধু ভাব চৌধুরীর। জলপাইগুড়িতে ফণীন্দ্র দেব স্কুলে প'ড়েছিলো সে দু'বছর। কিন্তু সে-দু'বছরের ইংরেজী বিদ্যে নিয়ে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে দু'ঘণ্টা গল্প করা একটু কঠিন বৈকি ! তবু ওরা অনেকক্ষণ কথা বলে।

আজও বাড়ী ফিরে চৌধুরী দেখলো ছেঁড়া কার্পেট সরিয়ে লম্বা ঝাঁটা নিয়ে এলসী ঘর পরিষ্কার করছে। কিন্তু এতো ময়লা জমেছে যে চোখে জল এসে গেছে তার। আস্তে আস্তে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো চৌধুরী।

গুড ইভিনিং এলসী।

গুড আফটারনুন, চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে এলসী হাসলো। এ ঘর পরিষ্কার করে লাভ কি বল, ওরা ফিরে এসে একদিনে আবার ময়লা ক'রে দেবে।

খুব স্বাভাবিক, ব্যাচেলাররা অমনি হয়।

তাই নাকি ? বিয়ে কর না কেন তোমরা ? না, বউ আছে তোমাদের দেশে ?

আমার কেউ নেই এলসী।

বেচারী ! তা' এখানে বিয়ে করবে, না দেশে গিয়ে ?

দেশে আর ফিরবো না আমি।

এদেশের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তোমার তাহ'লে, খিল খিল ক'রে হেসে বললো এলসী।

কিন্তু আমাকে কারুর পছন্দ হয় না যে।

বড় বিনয় তোমার।

এলসীর কাছে এসে তার একটা হাত ধরে চৌধুরী বললো, আমাদের দেশে অনেকদিন আগে শুধু একটি মেয়ের আমাকে পছন্দ হয়েছিলো —

তোমাকে ব্যথা দিয়েছে বুঝি? তা'তে আর কি হয়েছে? অমন কতো মেয়ে পাবে তুমি! একটা বন্ধু খুঁজে নাও এখানে, তাহ'লেই তোমার দেশের মেয়েকে ভুলে যাবে তুমি।

চৌধুরী বললো, সে ঠিক তোমার মতো দেখতে ছিল এলসী—

দূর, রাগ করে এলসী হাত ছাড়িয়ে নিলো, যা তা বলো না, তোমাদেব দেশের মেয়েরা তো কালো হয়।

না না, জিব কেটে বললো চৌধুরী, রঙের কথা বলি নি আমি। তার চেহারা ছিলো তোমার মতো। তাই তোমাকে দেখলেই আমার তাব কথা মনে হয়। চৌধুরীর কথা বলার ধরণে অন্য ইঙ্গিত মনে ক'রে এলসী বললো, বাট্ নো হোপ্ পুওর ম্যান্। আমি যে এখন এনগেজ্‌ড্। এই দেখ না আংটী। আর কয়েক মাস পরে জিমের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

আহা হা, লজ্জা পেয়ে চৌধুবী বললো, সেকথা বলি নি আমি।

হেসে বললো এলসী, লজ্জা পেও না। বল তো মাঝে মাঝে তোমাব সঙ্গে বাইরে বেরুতে পারি আমি। তবে শনিবার রবিবার হবে না কিন্তু। জিমের সঙ্গে থাকি আমি ও দু'দিন। আবাব এলসীর হাত ধ'রে বললো চৌধুরী, তোমাকে কোন দিনও বাইরে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। সেকথা তো বলিনি আমি। শুধু বলছিলাম, তোমাকে দেখলেই আমার আব একজনের কথা মনে পড়ে, তার নাম মালতী —

নিচে গোলমাল শোনা গেল। চৌধুরী বুঝতে পারলো ওরা সগৌরবে ফিরে এসেছে। এলসীর হাত ছেড়ে তাড়াতাড়ি ও ঘরের বাইরে এলো। কিন্তু দীনবন্ধু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সে-ঘরে।

কি হে বিটলে? এলসীর দিকে তাকিয়ে চৌধুরীকে বললো দীনবন্ধু, আছো বেশ! আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তেরো বচ্ছর আছি লণ্ডনে, তোমার মতো অমন সাধু ঘুঘু কতো দেখেছি —

আরে থামো থামো। কি রে রতনা কি হ'লো, খুলে বল ছাই, বিপদ-আপদ হবে নাকি কোনো?

কিন্তু রতন উত্তর দিলো না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপদ আবার কি? নাচের ভঙ্গী ক'রে হেবো বললো, খাতির কত! শালারা নবাবের মতন খাতিরে রাখলো আমাদের —

লণ্ডনের শ্রীঘর হালার শ্বশুর বাড়ী সে, ফের যামু আমি —

তাই যা না ব্লাডি, চেঁচিয়ে উঠলো দীনবন্ধু, শান্তি দে আমাদের। খাই-খরচার পয়সা লাগবে না শালা তোর আর —

গণেশ এতোক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলো। এবার এগিয়ে এসে সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললো, মাইণ্ড্ নেভার এগেন। ফাইট ইংলিচ ম্যান্, আই নট লাইক —

উঃ ইংরেজের ওপর বড়ো পিরীত যে, শালার শ্বশুর ইংরেজ —

মে বি চারটেনলি ফাদার-ইন-ল —

তবে যা না বেটা ফাদার-ইন-ল'র বাড়ী, এখানে প'ড়ে থেকে হাড় জ্বালাচ্ছিস কেন আমাদের?

চারটেনলি গোয়িং, ওয়েট পিউ ডেজ হালার পো হালা —

থাম্ থাম্ বেটা অবতার।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় তাহ'লে। কোর্টে কয়েক পাউণ্ড ফাইন দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দীনবন্ধু সাবধান ক'রে দিলো প্রত্যেককে, যেন এমন কাজ এরা কেউ আর কখনও না করে। নেশা করে মাতাল হওয়া আর অন্যকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলা এদেশের রীতি নয় একেবারে। ইণ্ডিয়া হাউসের সেই বাবুও আজ ওদের বুঝিয়েছে, ইণ্ডিয়ানদের দুর্ণাম ওরা যেন আর

কখনও না করে, তা'হলে এদেশে শুধু অসুবিধাই বাড়বে আর কিছু হবে না। কিন্তু ওরা এতো গোলমাল করছে যে ঠিক বোঝা গেল না দীনবন্ধুর কথার একবর্ণও ওদের কানে গেছে কি-না।

মালপত্র গুছিয়ে রতনকে আড়ালে ডেকে এক সময় বললো বিষ্টু, যাইরে রতনা এবার। মনটা বড়ো খারাপ, ভালো লাগে না তোদের লণ্ডনে আর —

এতো তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি ? থেকে যাও আর দু'একটা দিন।

না রে, বউটার জন্যে বড়ো মন কাঁদে।'

শুধু শুধু মন খারাপ ক'রে লাভ নাই বিষ্টুদা। যে গেছে সে তো আর কিছুতেই ফিরে আসবে না।

যাবে কোথায় রে আমার বউ ? সে তো লিভারপুলে আছে।

লিভারপুলে ? রতন বুঝতে পারলো না বিষ্টু কি বলছে।

একটা ঢোঁক গিলে বললো বিষ্টু, বিয়া আমি আবার একটা করছি বটে রতনা মাইরী—

কাকে ? কবে আবার তুমি বিয়ে করলে বিষ্টুদা ?

ইস্রায়েলেরে চিনিস ? আমাদের খিদিরপুরের লোক। তার শালীরে।

অবাক হ'য়ে রতন বললো, বল কি ?

সুন্দর মেয়ে, একটু লজ্জা পেয়ে বিষ্টু বললো, লিভারপুলেই বাড়ী তার —

কিন্তু কই আমরা তো শুনি নাই কিছু —

তোরা লণ্ডনে থেকে জানিস না কিছু, অথচ তাজ্জব ব্যাপার দেখ্, খিদিরপুরে খবর ঠিক পৌছালো শালার —

সেই রাত্তিরেই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বিষ্টু চ'লে গেল তার ইংরেজ বউয়ের কাছে লিভারপুল।

৬

এ বাড়ী ছেড়ে শিগগিরই উঠে যাবে গণেশ। এমনভাবে একপাল ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মতো থাকলে চলবে না তার। মেম বিয়ে ক'রে স্বাধীন ভাবে তাকে সাহেবদের মতো থাকতে হবে।

এতোদিন এদের সঙ্গে ছিলো কারণ খরচ কম এখানে। অন্য কোথাও গেলে চালাতে পারতো না। কিন্তু এখন সে আরও বেশী খরচ করতে পারে। আর্চওয়েতে ফলের দোকান খুব ভালোই চলছে তার। অনেক ইংরেজ খদ্দের আসে আজকাল। প্রথম প্রথম আসতো না কিন্তু তারা, কালো লোকের দোকান থেকে জিনিশ কিনতে চাইতো না সহজে। তাই ব্যবসা গুছিয়ে আনতে বেশ সময় লেগেছিলো গণেশের। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো তার মুখের দিকে। সাহস ক'রে কেউ কেউ এগিয়ে এসে বলতো, ব্ল্যাকি — ব্ল্যাকম্যান্। কিন্তু গণেশ রাগতো না। হেসে সেই সব ছেলেমেয়েদের আদর ক'রে ফল খেতে দিতো, দাম নিতো না এক পয়সাও। হয় তো বাড়ী গিয়ে তাদের মা বাপের কাছে বলতো তারা সেকথা। তাই বোধহয় আরম্ভ হ'লো গণেশের দোকানে ইংরেজ খদ্দেরের ভীড়, আর ফেঁপে উঠলো তার ফলের ব্যবসা। মাঝে মাঝে দেশ থেকে আমও আনায় গণেশ। আমের নামে ইংরেজের জিব দিয়ে জল পড়ে। আরও ভীড় বাড়ে দোকানে। পাড়ার লোকে গণেশের দোকানের নাম দিয়েছে, ব্ল্যাকম্যান্স্ শপ্। এতো সাহেব খদ্দের পেয়ে ভারী খুশী আজকাল গণেশ।

সবই তো হ'লো কিন্তু শুধু বিয়ে করবার মতো মেয়ে পায়নি গণেশ

এতোদিন। এখন অবশ্য ইচ্ছে করলেই সে বিয়ে ক'রে ফেলতে পারে। একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে সব।

দোকানের কাছাকাছি থাকে সে মেয়ে। নিয়মিত খদ্দের। নাম ডাফনী। বাবার নাম জন মার্টিন, বাসে কণ্ডাক্টারের কাজ করে। রোজ ভোর ছ'টারও আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে অনেক রাত্তিরে। ডাফনী কোথায় সে-খোঁজ করে না সে, বিছানায় পড়ে নাক ডাকায়। আরও বেশী দেরীতে বাড়ী ফেরে মিসেস মার্টিন। টিউব ট্রেনে চাকরী তার। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সে দেখে মেয়ে বাড়ী ফিরেছে কিনা। না ফিরলে ঘাবড়ায় না মোটেই, বরং খুশী হয়। ভাবে, হয়তো ডাফনীকে এখনও ছাড়েনি তার ছেলে-বন্ধু! বড়ো আনন্দে সময় কাটাচ্ছে তারা। তাড়াতাড়ি একটা মনের মতো বর খুঁজে পেলে নিশ্চিন্ত হয় সে। কিন্তু মেয়েটা শুধু বন্ধুই বদলায়, বন্ধুকে বর ক'রে নেবার কোন উৎসাহই নেই তার। তা করবেই বা না কেন যৌবন উপভোগ, বয়স ওর কতোই বা, মনে মনে ভাবে মিসেস মার্টিন। পাঁচ-দশটা বন্ধু যাচাই ক'রে বিয়ে করা উচিত বৈকি। ডাফনীর মতো বয়সে সে নিজেও তো অমন কত ছোকরার সঙ্গে ঘুরেছে। দেখতে মন্দ নয় তার মেয়ে, ঠিক সময় ঠিক লোককে সে বরাবরের জন্যে জুটিয়ে নেবে নিশ্চয়ই।

একদিন ডাফনী বললো, এবার একটা বিয়ে করবো মামি।

যাঃ, সত্যি বলছিস ?

হ্যাঁ মামি, প্রেমে প'ড়ে গেছি।

কার সঙ্গে রে ?

বলতো কার সঙ্গে।

মাইকেল ?

না না মামি, একটা ইণ্ডিয়ান —

ইণ্ডিয়ান ? বলিস কি রে ? আবার ইণ্ডিয়ান জোটালি কোত্থেকে ? তুই মা পরপর জোটাসও বটে। তা এ ছোঁড়া কে ?

ওই যে বার ফলের দোকান —

ওমা সেই ছোঁড়া, তা ও যে কুচকুচে কালো রে —

তা'তে কি হয়েছে? রাগের ভাণ ক'রে ডাফনী বললো, অনেক পয়সা ওর।

পয়সা? বলছিস? তবে ঠিক আছে! তবু দেখিস বাপু, ওরা একসঙ্গে অনেক বিয়ে করে শুনেছি।

না না, ও এখনও একটাও বিয়ে করে নি।

খোঁজ নিস ভালো ক'রে মা। আর তোর বাপ এ বিয়ের কথা শুনলে কি বলবে কে জানে! ইণ্ডিয়ান-টিয়ানের সঙ্গে আবার ঘুরঘুর আরম্ভ করলি কেন মা? দেশে কি ছেলে নেই আর?

গম্ভীর হ'য়ে ডাফনী বললো, আমি গণেশকে ভালোবাসি। ও ইংরেজ বাঁদরগুলোর চেয়ে অনেক ভালো!

তবে কর মা যা ভালো বুঝিস, বয়স হয়েছে তোর ভালমন্দ বোঝবার, আমি আর কি বলবো!

আলাপ করবে তুমি?

বেশ তো।

আসতে বলবো একদিন চা'য়ে তা'হলে?

দাঁড়া তোর বাপকে ব'লে দেখি আগে, ইণ্ডিয়ান বাড়ীতে ঢুকবে শুনলে সে ক্ষেপে না যায় —

তারপর ডাফনীর কাছ থেকে মিসেস মার্টিন শুনলো গণেশের আগাগোড়া কাহিনী। রাত্তির বেলা বাপ সমস্ত শুনে বললো, লাকি গার্ল, হাতী চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবে। তবে সে তো বাঘের দেশ, বাঘে খেয়ে ফেলবে না তো ডাফনীকে?

না। ইণ্ডিয়ায় যাবে না ওরা কখনও, ছোঁড়া এখানেই ব্যবসা করবে।

তবে আর ভাবনা কি, হাই তুলে পাশ ফিরলো জন মার্টিন।

ডাফনী বলছিলো ওকে একদিন চা খেতে বলবে —

নিশ্চয়ই, এই উইক-এণ্ডেই আসতে বলো, আমিও বাড়ীতে থাকবো এ শনিবার।

আচ্ছা বেশ।

স্বামী স্ত্রী নাক ডাকাতে আরম্ভ করলো। ডাফনী কিন্তু তখনও বাড়ী ফেরেনি। হয়তো কোথাও গণেশের সঙ্গে সেই মাঝ রাত্তিরে যৌবন উপভোগ করছে।

শনিবারে ডাফনীদের বাড়ী চা খেতে এলো গণেশ। বার্টন থেকে ন'মাসে করানো নতুন ব্রাউন স্যুট পরেছে সে। গলায় তার উলওয়ার্থের সবুজ টাই। ঝক ঝক করছে জুতো। ইংরেজ বৈকি গণেশ, পুরো সাহেব হ'য়ে গেছে সে।

লণ্ডন কাউনটি কাউন্সিলের তৈরী করা বিরাট বাড়ী। অনেক দরিদ্র পরিবার বাস করে সেখানে। তিনটে ক'রে ঘর পেয়েছে এক একটা পরিবার। বাড়ীর পেছনে প্রকাণ্ড পাকা উঠোন। সেখানে সারাদিন চীৎকার ক'রে খেলা করে এদের ছেলেমেয়েরা। মাঝে মাঝে ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে হেঁকে ওঠে কারুর মা, এই থাম্ থাম্ ছোঁড়ারা, নয়তো গিয়ে থাপ্পড় মারবো এক একটাকে —

কে শোনে কার কথা ? ছোঁড়ারা কিন্তু থামে না।

এই হ'লো সাহেবদের বাড়ী। পাইপ মুখে দিয়ে এদিক-ওদিক একটু ঘোরাঘুরি ক'রে ঠিক চারটের সময় কলিং-বেল্ বাজালো গণেশ। সময় জ্ঞান তার ইংরেজের মতোই বটে। ডাফনীরা থাকে এক তালাতেই। কিন্তু সেই খেলুড়ে ছোঁড়াগুলো ঘিরে ধরলো গণেশকে।

হ্যালো ব্ল্যাকি !

হ্যালো ইণ্ডিয়ান !

ক্রুট প্লিজ, ক্রুট — একটা ছেলে হাত ঢুকিয়ে দিলো তার পকেটে।
এমন সময় দরজা খুললো ডাফনী, এসো গণেশ। এই ছোঁড়াগুলো, বেরো
এখান থেকে —

গুড আফটারনুন, হেসে গণেশ বললো।

তাকে নিয়ে লাউঞ্জে এলো ডাফনী। সেখানে বসেছিল তার মা আর বাবা। তাদের সঙ্গে আলাপ হ'লো গণেশের।

পকেট থেকে নকল মুক্তোর মালা বের ক'রে মিসেস মার্টিনকে বললো গণেশ, ইওর নেকলেচ মামি।

কী খুশী মামি সেটা পেয়ে, অনেক ধন্যবাদ বাছা।

এণ্ড ইওর চিগ্রেট কেচ ডাডি —

থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয়, মিঃ মার্টিন সিগ্রেট কেস্ হাতে নিয়ে বললো, ভেরি নাইস্ ইন্‌ডিড।

আর আমার জন্যে কি ?

ডাফনীর দিকে তাকিয়ে বললো গণেশ, নাথিং ফর ইউ বিকজ আই এম ইউর। খুব একটা রসিকতা করেছে মনে করে সে নিজেই জোরে হেসে উঠলো।

বেশ সাজানো ঘর। একটা পিয়ানোও রয়েছে সেখানে। রেডিও বাজছে। মেঝেতে লাল রঙের পুরু কার্পেট পাতা। বুক-সেলফে অনেক মোটা মোটা বই। চেষ্টা ক'রে একটার নাম পড়লো গণেশ, ব্রিটিশ বার্ডস্।

রুটি জ্যাম মার্মালেড কেক আর ফিস-পেইস্ট দিয়ে ওরা চা খেতে লাগলো। ধন্য হ'য়ে গেল গণেশ। খাঁটি ইংরেজ পরিবারের মধ্যে সে জাঁকিয়ে ব'সে আছে। আর কারুর ভাগ্যে হবে এ রকম ?

গণেশ চ'লে যাবার পর সেই সন্ধ্যায় ডাফনী মাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখলে মামি ?

মিসেস মার্টিন তখন গণেশের দেওয়া নেকলেস গলায় প'রে দেখছে তাকে কেমন মানায়। ডাফনীর কথা শুনে বললো, সুন্দর ছেলে। কী ভদ্র! হ্যাঁরে ডাফনী, নেকলেসটা কেমন মানিয়েছে রে ?

চমৎকার। তবে বিয়ের ব্যাপারে —

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস মার্টিন বললো, কি, বিয়ের ব্যাপারে কি শুনি ?

না মানে, আত্মীয়-স্বজনরা একটু আপত্তি করবে —

করে করুক, তোমার মুখ-পোড়া আত্মীয়-স্বজনরা কি আমাকে এমন নেকলেস দেবে ? ডাফনীর ভাগ্য ভালো সে এমন ছেলেকে বন্ধু পেয়েছে।

হেসে ডাফনী বললো, গণেশেরও ভাগ্য ভালো মাম্মি —

আরে রাখ তোর বাজে কথা, বাধা দিয়ে মিসেস মার্টিন বললো, এখন চট ক'রে বিয়েটা ক'রে ফেল দেখি, তোর কপালে তো টেকে না কেউ বেশীদিন।

আমিই টিকি না। কাউকে যে ভালো লাগে না আমার।

এ যাত্রা দয়া ক'রে টিকে থাক মা, এ ছেলেটাকে হাত ছাড়া করলে দুঃখ করবি ব'লে দিলুম।

অমন কতো জুটবে আমার।

থামা তোর বড়ো বড়ো কথা। এমন নেকলেস দেনেওয়ালা ছেলেদের তোর মতো মেয়ে বন্ধুর অভাব হয় না, বুঝলি ?

হেসে ডাফনী বললো, নেকলেস তো আমাকে দেয় নি, দিয়েছে তোমাকে।

কথায় তোর সঙ্গে আমি পারবো না মা।

একটু কেশে মিঃ মার্টিন বললো, সিগ্রেট কেসটার কিন্তু অনেক দাম।

ওর যে-প্রচুর পয়সা ড্যাডি।

হুঁ ? ইণ্ডিয়ানদের পয়সা আছে শুনি। তবে ওদেশে লোকে আবার না খেতে পেয়ে ম'রেও যায় —

আঃ, নেকলেস দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ডাফনীর মা, তোমাকে কতবার বলবো খুড়ো মিস্সে যে ওরা ইণ্ডিয়ায় যাবে না — যাবে না, এখানেই ব্যবসা করবে, — শুনলে কথা ?

ও তবে ঠিক আছে, হেসে বললো ডাফনীর বাবা, ফল পাওয়া যাবে ঝুড়ি ঝুড়ি, কি বলিস ডাফনী ? আমার শুভ কামনা — মঙ্গল হোক তোর মা !

সেই থেকে গণেশ প্রায়ই যায় ডাফনীদের বাড়ী।

গণেশের ভাবী শ্বশুর আসলে রসিক লোক। আজকাল তাকে দেখলেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বাঘের ডাক ডাকে আর মুখের সামনে হাত বেঁকিয়ে হাতীর শুঁড় দেখায়। তার ধারণা ভারতবর্ষের পথে পথে বাঘ আর হাতী ঘুরে বেড়ায়।

ডাক শুনে হবু শাশুড়ী বলে, ও তো শুয়োরের ডাক, বাঘ অমনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ডাকে বুঝি ?

শ্বশুর বলে, ডাকে গিন্নী ডাকে, জিজ্ঞেস কর না গণেশ বাছাকে।

জিজ্ঞেস করবার আগেই গণেশ চটপট করে উত্তর দেয়, ইয়েস মামি লিটিল টাইগার ডু ঘোঁৎ ঘোঁৎ —

তাই নাকি ? বাঘ তুমি দেখেছ বাছা ?

ও ইয়েস, হেসে বলে গণেশ, ইন জু গার্ডেন, বাট বিগ নট লিটিল — কথা শেষ না করেই সে কী হাসি গণেশের !

একদিন মিঃ মার্টিন জিজ্ঞেস করলো, ওহে বাছা, রোপ-ট্রিক্ জানো ?

কথাটার মানে না বুঝে গণেশ স্রেফ ব'লে দিয়েছিল, ইয়েস।

তারপর এক শনিবারে গণেশের প্রাণ যায় আর কি ! বহু লোক জড়ো হয়েছে ডাফনীদের বাড়ীতে। তার বাবা সকলকে ব'লে বেড়িয়েছে, আমার হবু জামাই ইণ্ডিয়ান রোপ-ট্রিক্ দেখাবে আজ।

গণেশ আসতে না আসতেই এক দড়ি হাতে ক'রে ছু'টে এলো: মিঃ মার্টিন, এসো বাছা রোপ-ট্রিক্ দেখাও —

দড়ি আর অতো লোক দেখে গণেশের তো চক্ষু ছানাবড়া। ফাঁসি দেবে নাকি তাকে আজ এরা!

দড়ি নেড়ে চেড়ে সে বললো, হোয়াট হোয়াট ?

কাম অন্ — রোপ-ট্রিক্ —

রোপ-ট্রিক হোয়াট ?

ফেমাস ইণ্ডিয়ান ম্যাজিক —

আই ডোণ্ট নো।

হবু জামাই-এর মুখ দেখে মিসেস মার্টিন মনে করলো অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। স্বামীকে আড়ালে ডেকে তাড়া দিয়ে বললো, বলা নেই কওয়া নেই হুপ করে কেন বেচারিকে লজ্জায় ফেলছো ? আর আগে থেকে তৈরী না থাকলে কেউ দেখাতে পারে নাকি ম্যাজিক ? কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি তোমার একটুও মুখপোড়া মিন্সে ?

তাই তো, সবি, ব'লে তখন স'রে পড়লো বটে মার্টিন, কিন্তু তারপর থেকে গণেশকে একা পেলেই বলে, কিহে বাছা, কবে দেখাবে বলো রোপ-ট্রিক্ ?

গণেশ উত্তর দেয়, আফটার ম্যারেজ।

আজকাল প্রায়ই হবু শ্বশুর শাশুড়ী আর ডাফনীকে নিয়ে বেড়াতে বার হয় গণেশ।

মিসেস মার্টিন আপত্তি ক'রে বলে, তোমরা যাও বাছা, আমরা তোমাদের অসুবিধা ঘটাবো শুধু শুধু —

নো নো, গণেশ শাশুড়ীর হাত ধ'রে বলে, ইউ আর মাই মামি-ডাডি, চারটেনলি ইউ কাম্ —

আসলে গুষ্টিশুদ্ধ ইংরেজ নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে গর্ব হয় গণেশের। ইণ্ডিয়ান-

গুলো হাঁ ক'রে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গণেশের মতো এমন সৌভাগ্য ক'টা লোকের হয়! দু'হাতে পয়সা খরচ করে সে ওদের পেছনে। সিনেমা দেখায়, নৌকো বাওয়ায়, দিশি রেস্তোরাঁয় খাওয়ায় আর হাইড পার্কে ঘোড়ায়ও চড়ায় গণেশ মাঝে মাঝে হবু শ্বশুর-শাশুড়ীকে।

বাড়ী ফিরে মিসেস মার্টিন বলে, ওরে ডাফনী সুখে থাকবি তুই। কী কপাল তোর। আর আমার পোড়া কপালে কিনা জুটলো একটা বুড়ো বাস্-কণ্ডাক্টার —

কথা শুনে জোরে জোরে কাশে মিঃ মার্টিন।

কাজেই বিয়েটা একরকম ঠিক গণেশের। কিন্তু একথা কেউ জানে না— রতনও নয়। একটা ইণ্ডিয়ানকেও সে নেমন্তন্ন করবে না। সে যেন কোন ভারতীয়কে চেনেই না। বিয়ের পর নিশ্চয়ই সে বাংলা ভুলে যাবে। এতো-দিন তার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হয়নি শুধু ওই নোংরা ইণ্ডিয়ানগুলোর জন্যে। ওদের সঙ্গে মেশামেশি একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

চুপেচাপে গণেশ ঘর খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথাও না পেয়ে একেবারে অনিচ্ছায় সে শরণ নিলো আলি সাহেবের।

আলি সাহেব বাইশ বছর আছে লণ্ডনে। বছর কয়েক হ'লো একটা গোটা বাড়ী কিনেছে অল্ডগেটে। লোক ভালো আলি সাহেব, অবস্থাও ভালো তার। নানারকম ব্যবসা আলি সাহেবের, নকল মণি-মুক্তো, দিশি আতর, আরও নানা জিনিশের। মেম বউ তার, আর একমাত্র ছেলে, নাম টিপু। ইংরেজের মতো ফর্সা রঙ টিপুর। বয়স সাত-আট বছর। প্রায়ই বউকে সঙ্গে নিয়ে আলি সাহেব লণ্ডন-মস্কে নমাজ পড়তে যায়।

তাই শুনে দীনবন্ধু মাঝে মাঝে বলে, শালার তিন তিনটে মসজিদ এখানে অথচ কালীবাড়ী নেই একটাও, কতোদিন যে মায়ের চরণামৃত মাথায় ঠেকাইনি। নাঃ, শালার হিঁদুগুলোর আর কিছু হবে না।

রাজ্যশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান আলি সাহেবের ছেলের আব্বল। রাস্তায় দেখা হ'লে

সবাই ফুটফুটে টিপুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। রতন তার নাম দিয়েছে টিপু সুলতান। বেশ সুন্দর ইংরেজী বলতে পারে তো ছেলেটা — তাকে আদর করতে করতে রতন ভাবে মনে মনে।

ওদের সঙ্গে একরকম গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রে বাড়ী ছেড়ে দিলো গণেশ।

দীনবন্ধু বললো, যা শালা দেখা যাবে কতো ইংরেজের ঘর-জামাই হোস্ তুই —

চাট আপ্ হালার পো হালা!

কিন্তু কিছুদিন পর রতন খবর দিলো, সত্যি মেম বিয়ে ক'রেছে গণেশ, আর আলি সাহেবের বাড়ীর দু'টো ঘর ভাড়া নিয়ে বউকে এনেছে সেখানে। আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা কিন্তু চিনতেই পারলো না আমাকে —

চৌধুরী এক সুরে ব'লে উঠলো, তারা তারা!

দীনবন্ধু বললো, মরুক বেটা। সাধে বলে ভালো করতে হয় না কারুর। এতো করলাম আমরা বেটার জন্যে আর শালা এতো বড়ো হারামজাদা আমাদের খবরও দিলো না একটা —

বিয়েটা তাহ'লে সত্যি চুকে গেছে গণেশের!

৭

বিষ্টুর বউএর নাম ক্ল্যারা। এক রবিবারে বউকে নিয়ে আবার লণ্ডনে এলো বিষ্টু। সঙ্গে এলো তার ভায়রা ভাই ইস্রায়েল আর বন্ধু রহমান।

এতোদিন বিষ্টু ছিলো ইস্রায়েলের ফ্ল্যাটে। কিন্তু ছেলেপিলে হবে ইস্রায়েলের বউএর। তাই ছুটী নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাচ্ছে, সিলেটে রেখে আসবে বউকে এবার। আর এদিকে বিষ্টুকেও ঘুরতে হবে জাহাজে জাহাজে — আফ্রিকা আমেরিকা সিলোন — কত জায়গায় যাবে সে। কিন্তু ক্ল্যারাকে রাখবে কোথায়? তিন চার রাত ভাবনায় বিষ্টুর ঘুম হ'লো না।

বিষ্টুর বউকে দেখবার জন্যে অল্ডগেটের সমস্ত বাড়ী ভেঙে পড়লো রতনের ঘরে।

হেলো হেলো?

গুড মর্ণিং!

কনগ্রাচুলেশনস্ —

চৌধুরী শাদা ময়লা পাজামা আর গেঞ্জি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আনন্দে সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়ালো ক্ল্যারার সামনে। তার ঘাড় ধ'রে বললো দীনবন্ধু, বলি কোট প্যাণ্ট কিনেছো কি মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে? হ্যাঁ রে বামুনের ঘরের ভূত —

চৌধুরী জিব-কেটে ছুটে গেল ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়াতে। সে ফিরে এলে তার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বললো দীনবন্ধু, আদব-কায়দা তোমাকে শেখায় কার বাপের সাধ্যি!

রতন ক্ল্যারার মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে মাথা নিচু ক'রে চুপ

ক'রে ব'সে রইলো। আজ বিষ্টুকে তার একটুও ভালো লাগছিলো না — তার বউকেও নয়।

সে ভাবছিলো খিদিরপুরের একটি নির্দোষ বাঙালী মেয়ের কথা। বিষ্টুর কাকার চিঠি প'ড়ে রতন আজও মনে রেখেছে তার নাম — দুর্গা। তার চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠছে ডুরে শাড়ি পরা সরল একটি বাঙালী মেয়ের ছলোছলো মুখ। অনেক — অনেকদিন আগে মৃত স্বামীর চিতায় নিজেকে ভস্ম করতো হিন্দু মেয়েরা। পুড়ে মরবার সময় দুর্গা কি সেই কথা ভেবেছিলো? গুজবে হয়তো সে বিশ্বাস করেনি। শেষরাত্রের স্বপ্নে পাগলা মহেশ্বর তাদের ঠিক খবর দেয়। প্রবাসী স্বামীর মঙ্গল কামনায় যখন তাদের ঘুম আসে না তখন ভোলা শিব মনের মুকুরে মেলে ধরে স্বামীর প্রতিমূর্তি আর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাত হাজার মাইল দূরে ব'সে তাই ক্ল্যারাকে চিনেছিলো দুর্গা। আর বিষ্টুর বিয়ের আগাগোড়া দৃশ্য একদিন শেষরাত্রে নিশ্চয়ই দেখিয়েছিলো তাকে পাগলা মহেশ্বর। স্বামীর অপমৃত্যু সে সহ্য করতে পারেনি, তাই হাসতে হাসতে চ'লে গেছে তার মহাবরের কাছে। বাঙলার সতী মেয়ের চোখে ধুলো দেবে কোন স্বামী? লণ্ডনে থেকে রতন জানে না কিছু অথচ দুর্গার কানে পৌঁছলো সব কথা! কার সাধ্য তাকে অসুখী করে? এতো মনের জোর আর কার? তাই তো বার বার রতন স্বপ্ন দেখে তার সোনা বউএর। তার বউ হবে সতী, হবে তার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, জানবে একমাত্র তাকেই। তার কথা ভাবলেই শিহরণ লাগে রতনের।

বিয়া আমি করতে চাই নাই রতনা, তুই বিশ্বাস কর।

আমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছি তোমাকে?

তবে অমন রাগ-রাগ মুখ কেন তোর?

অমনি।

তুই দেখ ক্লেয়ারে, অমন ভালো মেয়ে হয় না।

নিজের বউএর কথা সবাই অমনি ভাবে।

তুই দেখ না, আগে ভালো করে পরিচয় কর।

চাই না আমি পরিচয় করতে।

তুই ওকথা বললে কে দেখাশুনা করবে আমার পরিবারের ?

তার মানে ?

আমি তো জাহাজে যাবো, কখন কোথায় থাকি ঠিক নাই। তাই বউকে রেখে যাবো তোদের কাছে —

এই বাড়ীতে ?

হ্যাঁরে রতন।

বাড়ী আমার একার নয়, আর এ বাড়ীতে মেয়েদের থাকার অসুবিধা অনেক।

আমার বউ কোন অসুবিধা গেরাহ্যি করে না রে রতনা। দীনবন্ধুর আপত্তি নাই কোনো, চৌধুরীও রাজী, শুধু তুই —।

সকলের মত থাকলে আমি না বলবার কে ?

তোদের কত সুবিধা হবে দেখিস। সংসারের কাজে ক্ল্যারার জুড়ি মেলা ভার। বিয়া কি আমি শুধু শুধু করলাম রে ?

অতো কথা না বললেও চলবে বিষ্টুদা, ওসব কথায় দরকার নাই আমার। সকলের মত থাকলে আমারও অমত নাই।

বিষ্টু বউ রেখে চ'লে গেল। সঙ্গে গেল ইস্রায়েল আর রহমান। রতন তার ঘর ছেড়ে দিলো ক্ল্যারাকে। নিজে এলো চৌধুরীর ঘরে।

তারা তারা, বললো চৌধুরী, মেয়ে না থাকলে কি বাড়ীর শ্রী খোলে!

থাম্ থাম্ বিটলে, দীনবন্ধু তার গলায় ব'লে গেল, লণ্ডনে বসেও ছিরি খোলবার সাধ শালার —

তারা তারা, হেসে বললো চৌধুরী।

বিষ্টু যে ক'দিন ছিলো সে ক'দিন খুব পোলাও মাংস খেয়েছে এরা।

ইস্রায়েল আর রহমান রান্না করেছে। পেশোয়ারী আতপ এনেছিলো ওরা দশ সের।

আজও চৌধুরী ঢেকুর তোলে আর বলে, আবার কবে আসবে ওরা? জাহাজে চাকরী করার সুখ অনেক, ভালো চালের ভাবনা ভাবতে হয় না মোটে —

হ্যাঁ রে হ্যাংলা বামুন, হাঁকে দীনবন্ধু, হাজারবার বলেছি হেউ হেউ ক'রে বিলেতে ঢেকুর তুলবি না, তা স্বভাব যাবে কোথায় বিটলের?

চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে, পারডেন।

পার্ডেন, দাঁত খিঁচোয় দীনবন্ধু। বাড়ীতে বিষ্টুর ইংরেজ বউ, একটু আদব কায়দা মেনে চলবি, তা না হ'লে ও ভাববে ইণ্ডিয়ানগুলো তোর মতো জংলী ভূত — বুঝলি?

চৌধুরী ঘাড় নেড়ে জানালো যে সে বুঝেছে।

দীনবন্ধুর কথা শুনে মনে মনে হাসে রতন। তার সব সময় ভয়, পাছে ইণ্ডিয়ানদের নাম খারাপ হয় এখানে। যেন, আবার হাসে রতন, ইণ্ডিয়ানদের লণ্ডনে কতোই নাম!

বিষ্টু চ'লে যাবার দিনকয়েকের মধ্যে অনেককেই যেতে হ'লো। মুন্দ বেচ্চো হেবো শিবে আবার জুটলো জাহাজের ডাকে সাড়া দিতো। ওদের খালি ঘরে রতন আসবো আসবো করছে, এমন সময় একদিন বললো দীনবন্ধু, একটা মুস্কিল হয়েছে রে —

কি মুস্কিল?

বেচারার উপকার না করলেই নয়।

কার উপকার?

আরে সেই কথাটা বলবার জন্যেই তো আমি বসে আছি তোর জন্যে রাত্তির জেগে।

কি কথা বল, রতন ভয়ে ভয়ে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। আবার সে মোটা টাকা ধার না চেয়ে বসে।

ভদ্দরলোকের ছেলে বড় বিপদে পড়েছে রে, ইণ্ডিয়া হাউসে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। বাপ সন্দেহ ক'রে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। অথচ ভদ্দরলোকের ছেলে তো, জেদ ষোল আনা। বলে, ছ'মাস পর আমার পরীক্ষা, এখন কি করি আমি ?

তা' কি করতে বল আমায় ? টাকা চাই নাকি কিছু ?

না না, টাকা সে চায় না। ভদ্দরলোকের ছেলে, হাত পেতে টাকা কি নিতে পারে আমাদের কাছে ?

তবে আর কি করতে পারি আমরা ?

একটু চুপ করে থেকে দীনবন্ধু বললো, আমি তাকে কথা দিয়েছি এই বাড়ীতে এসে থাকবে সে। পয়সা নেব না আমরা একটাও। ভদ্দর-লোকের ছেলের একটা উপকার করতে পারলে পুণ্যি হবে রে রতনা, পাপ তো করেছি কতো তার ঠিক নাই।

এই বাড়ীতে ? ভদ্দরলোকের ছেলে ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দীনদা ? এ বাড়ীতে থাকতে পারে কখনও সে ?

মাথা চুলকে বললো দীনবন্ধু, আমি সব খুলে বলেছি তাকে, আপত্তি নাই তার কোনো। আর বাড়ীতে জায়গাও তো আছে এখন রতনা। ভদ্দর-লোকের ছেলে — বড় মায়া লাগলো কিনা আমার !

রতন আর কিছু বললো না। সে চুপ ক'রে ভাবছিলো, মায়া-দয়া তাহ'লে আছে দীনবন্ধুর।

ট্যাক্সিতে জিনিশপত্র চাপিয়ে এসে উঠলো একদিন বঙ্কিম। ওরা তার ঘর গুছিয়ে ঝক ঝকে ক'রে রেখেছে। সঙ্গে এনেছে বঙ্কিম রাশি রাশি বই। এরা তাকে কেমন ক'রে খাতির করবে ভেবে পেলো না।

সকলের সঙ্গে আলাপ হ'লো বঙ্কিমের। কিন্তু নাম ধ'রে তাকে ডাকলো না কেউ। দীনবন্ধু তার নাম দিয়েছে, খোকাবাবু।

নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই খোকাবাবুর। খালি বই আর বই। কোনো দিকে তাকায় না সে, মাথা নিচু ক'রে শুধু প'ড়েই যায়।

খাবার পর যখন খোকাবাবু নিজের বাসন নিজে ধুতে যায় তখনই এদের সঙ্গে লাগে তার মারামারি।

না না না, খোকাবাবু —

কেন ? সবাই তো নিজের বাসন নিজে ধোয় এখানে ?

কিন্তু সবাইএর তো আর পরীক্ষা নেই ছ'মাস বাদে। তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু প'ড়ে যাও। পাশ হ'লে তারপর যা খুশী ক'রো তখন।

কিন্তু এটা অন্যায় নয়?

কিছু অন্যায় নয়, দীনবন্ধু বলে, ভদ্দরলোকের লেখাপড়া জানা ছেলে তুমি খোকাবাবু, আহা কতো কষ্ট হচ্ছে তোমার এখানে বলো তো !

এতো সুখে আর থাকবো কোথায় ? একটু থেমে খোকাবাবু বলে, ভদ্রলোক বন্ধুরা তো এখন আর চিনতেই পারে না আমাকে।

না পারুক, ড্রেসিং গাউনের দড়ি নাড়তে নাড়তে চৌধুরী বলে, আমরা থাকতে তোমার কোনো ভাবনা নাই খোকাবাবু।

আপনাদের কাছে আমি যে কী কৃতজ্ঞ, জল এসে পড়ে খোকাবাবুর চোখে।

থাক্ থাক্ খোকাবাবু, আগে পাশটা ক'রে নাও দেখি ভালো ক'রে।

খোকাবাবুর একরাশ বইএর দিকে মাঝে মাঝে রতন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, ওর একটা বইও যদি সে পড়তে পারতো !

খোকাবাবু অতোগুলো বই পড়তে হয় তোমার ?

হ্যাঁ, হাসে খোকাবাবু।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে থাকে রতন। লেখাপড়া শেখার সাধ তার অনেকদিনের।

৮

ডাফনীকে বিয়ে ক'রে গণেশ এসে উঠলো আলি সাহেবের বাড়ী। এক তালায় দু'টো বেশ বড়ো বড়ো ঘর, আলাদা বাথরুম আর পাশেই একটা ছোট রান্নাঘর।

ভাড়া বেশী নিতে চায় না আলি সাহেব। বলে, দেশের ছেলে তুমি যা হয় ধ'রে দিও, বাড়ী ভাড়া দেবার ব্যবসা নয় তো আমার।

তার স্ত্রী বলে, নতুন বিয়ে করেছো তোমরা, আমরা রয়েছি পাশে যখন, যা দরকার বোলো, কোন সঙ্কোচ ক'রো না।

আলি সাহেব যদি মেম বিয়ে না করতো তাহ'লে গণেশ কিছুতেই উঠতো না এখানে। তবু আলি সাহেবের চারপাশে একটা ইংরেজী গন্ধ আছে। আর টিপুর চেহারা তো একেবারে সাহেবদের মতো। কিন্তু আলি সাহেব যখন গণেশকে দেশের ছেলে ব'লে উল্লেখ করে তখন মনে মনে খুবই রেগে যায় সে। ভাবে, একটু পুরোনো হ'লে আলি সাহেবকে বারণ ক'রে দেবে আর ওকথা বলতে। যাক আপাতত আলি সাহেবের ফ্ল্যাট পেয়ে খুশী হ'লো গণেশ।

কিন্তু নাক সিঁটকে ডাফনী বললো, এ মা, এই নোংরা পাড়ায় থাকতে হবে নাকি আমাদের?

হোপলেস্, নো বিল্ডিং নো হোয়্যার্।

কিন্তু এই জঘন্য দু'টো ঘরে থাকবো কেমন ক'রে? বন্ধু বান্ধব বেড়াতে এলে কি ভাববে?

ভেরি মাচ্ ট্রাইং, নিউ বিল্ডিং কুইকলি গেটিং—

হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি খোঁজ কর। এখানে বেশীদিন থাকলে ম'রে যাবো আমি।

প্রথম কয়েকদিন প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাটলো। ফলের দোকান এখন বন্ধ রেখেছে গণেশ। বিয়ের আগে ডাফনী চাকরী করতো কারখানায়, এখন সংসার করবে ব'লে চাকরী ছেড়েছে। কাজেই সারাদিন তারা শুধু ঘুরে বেড়ায়। আর ভালো ভালো রেস্তোরাঁয় দামী দামী খাওয়া খায়। মেম বিয়ে ক'রে গণেশ ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তাই নতুন ফ্ল্যাট খোঁজবার খেয়াল থাকে না তার, সময়ও হয় না। ডাফনী কেবলই বলে, এ দাও ও দাও তা-দাও। টেনিস খেলবো র‍্যাকেট কিনে দাও, স্কেটিং করবো বুট এনে দাও, সাঁতার কাটবো নতুন কস্ট্যুম কিনে দাও—এমনি আরও অনেক ফরমায়েস। ডাফনীর মন যোগাতে গণেশ দু'হাতে টাকা খরচ করতে লাগলো। কিন্তু একদিন বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হ'লো ডাফনীকে, হেলো ডার্লিং টু-মরো শপ্ ওপেনিং—

এতো তাড়াতাড়ি কেন প্রিয়তম? কিছুদিন কি সবুর করা যায় না?

নো নো, মানি নিয়ার্লি অল ফ্লাইড।

কি?

নো মানি—মানি ফ্লাইড, হাত নেড়ে বললো গণেশ, ফ্লাইড। নাও নট শপ্ ওপেনিং হোয়াট ইটিং?

কি? বেশ অবাক হ'য়ে ডাফনী জিজ্ঞেস করলো, কত হাজার পাউণ্ড আছে তোমার ব্যাঙ্কে?

নো ব্যাঙ্ক—মাই মানি পোস্টাফিস।

রীতিমতো হতাশ হয়ে ডাফনী বললো, কত টাকা আছে তোমার পোস্ট অফিসে?

ফোর্ শিলিংস্।

কি! ডাফনী প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো, এই সামান্য টাকা নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে সাহস করেছিলে?

যানি ফ্লাইড হস্ আফটার ম্যারেজ —

চুপ করো ! ছি ছি এখন কি করবো আমি !

ঘাবড়ে গিয়ে গণেশ বললো, নট এংরি ডার্লিং। শপ ওপেনিং, প্রেটি ছেলিং, মানি কামিং কুইকলি।

তুমি বদমাইস, তুমি জোচ্চোর, তুমি ঠকিয়েছো আমাকে —

নো নো, আই নট —

চুপ করো, চুপ করো। আমার বন্ধু মাইকেলকে আমি নেমন্তন্ন করেছি শনিবারে, আমরা সবাই মিলে থিয়েটারে যাবো — এখন কি হবে ?

ডাকনীকে শান্ত করবার জন্যে গণেশ তাড়াতাড়ি বললো, মিঃ আলি মেনি মানি, আই টেক্ সাম্ ক্রম্ হিজ —

যা খুশী করো তোমার, আমি জানি না কিছু। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে ডাকনীর।

আলি সাহেবের কাছ থেকে সত্যি টাকা ধার করলো গণেশ। তারপর টাল সামলে আবার দোকান খুললো। এবার চৈতন্য হ'লো তার। কিন্তু তা'তে ফল হ'লো না বিশেষ। ডাকনী ভাবলো গণেশ মিথ্যা কথা বলেছে তাকে। আসলে তার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে। তাই স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রে সে ঘন ঘন নেমন্তন্ন করতে লাগলো বন্ধু মাইকেলকে।

ইণ্ডিয়ানদের একেবারেই পছন্দ করে না মাইকেল। তাই যখন গণেশ বাড়ীতে থাকে না তখন সময় ক'রে আসে। ডাকনীর ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারে না আজও। গণেশ সঙ্গে থাকলে ডাকনীকে নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না মাইকেল। কালো লোকের সঙ্গে রাস্তায় চলতে তার লজ্জা হয়। মাঝে মাঝে গণেশকে বাদ দিয়ে ডাকনীকে নিয়ে বেড়াতে বার হয় সে। ডাকনী গণেশকে বুঝিয়েছে ইংরেজ স্বামীরা এতে কিছু মনে করে না। আর গণেশও বুঝেছে তাই, সেও কিছু মনে করে না।

ডাকনী আরও বুঝিয়েছে যে মাইকেল গণেশের সঙ্গে বেশী কথা বলে না'

আর তারা সামনে বেশী আসতে চায় না, কারণ গণেশের ভাষা বুঝতে পারে না সে।

একথা শুনে বেশ একটু দুঃখিত হ'য়ে গণেশ বললো, বাট্ ইউ আণ্ডারস্টেন্ মি ?

আমি যে তোমাকে ভালোবাসি।

আই টক্ গুড ইংলিচ্ ?

নিশ্চয়ই, দিন দিন উন্নতি হচ্ছে তোমার।

এবার খুব খুশী হ'য়ে গণেশ বললো, আই ইংলিচ্ —

যখন গণেশ বাড়ী ফিরে দেখে যে ডাফনী নেই, হয়ত মাইকেলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, তখন মাঝে মাঝে আলি সাহেবের ফ্ল্যাটে যায় সে। আলি সাহেব আর তার স্ত্রী বুঝতে পেরেছে যে ডাফনী তাদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ পছন্দ করে না, তাই আস্তে আস্তে তারা দূরে স'রে গেছে। তবু গণেশ টাকা চাইলেই হাসিমুখে তাকে টাকা ধার দেয় আলি সাহেব, আর তার স্ত্রী বলে, যখন যা দরকার ব'লো, আমার স্বামীর দেশের ছেলে তুমি। ওই 'দেশের ছেলে' শুনেই 'থ্যাঙ্ক ইউ' ব'লে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে গণেশ।

বাইরে কোন খাওয়াই খায় না আলি সাহেব — তার স্ত্রীও নয়। সমস্ত খাওয়া বাড়ীতে তৈরী করে তার স্ত্রী। লাঞ্চের সময় স্বামীর কাজ থাকলে সঙ্গে লাঞ্চ দিয়ে দেয়। টিপুকে তার মা নিজে পড়ায় আর সাজিয়ে গুজিয়ে ইস্কুলে পাঠায় রোজ। সিলেট থেকে শাড়ী আনিয়েছে আলি সাহেব। বেশীর ভাগ সময় সেগুলো পরে থাকে তার স্ত্রী। গণেশ এদের সংসার করা দেখে আর ভাবে, ডাফনী এমন করলে এতো পয়সার ভাবনা হ'তো না তার।

পয়সার টানাটানির জন্যে একদিন বাধ্য হ'য়ে গণেশ বললো ডাফনীকে, হোয়াই নট কুক্ হোম ডেলি ? ভেরি চিপ্। আউট ইটিং অল্ মানি গোয়িং —

মুখ নাড়া দিয়ে ডাফনী বললো, এই নোংরা ঘরে আমি রান্না করতে পারবো না।

বাট আলিজ ব্রাইড কুক্ — সী নাইস্ ম্যান্।

ও তো জিপসী, ওরা সব পারে।

'জিপসী' কথাটার মানে জানে না গণেশ। ভাবলো ওটা একটা ভালো বিশেষণ, তাই বললো, ইউ জিপসী।

কি? আমি শাড়ি পরি ওর মতন? ঘেন্না করে আমার ইণ্ডিয়ানদের পোষাক দেখলে।

ডাফনীর আরও কাছে এগিয়ে এসে গণেশ বললো, বাট মাই ড্রেস্ মারবৈলাস, আই ইংলিচ।

একদিন টিপু সুলতানকে দেখতে পেয়ে গণেশ বললো, হেলো টিপু কামিং মাই রুম্?

আন্টি মেরেছে আমাকে, তোমাদের বাড়ী যেতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

গণেশ বাড়ী ঢুকতেই ডাফনী বললো যে টিপুকে যেন বেশী লাই না দেয় সে। ছেলেমেয়ে ভালো লাগে না তার।

বাট হি লিটিল সান্ —

চুপ করো তুমি।

চুপ করতেই হ'লো গণেশকে। ওদিকে মাইকেল আসে নিয়মিত। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তার সম্বন্ধে নানা গল্প বলে ডাফনী গণেশকে। বড়ো ভালো ছেলে মাইকেল। যুদ্ধে গিয়ে খুব নাম করেছিলো। আর একটু হ'লেই লেফটেনেন্ট্ হ'য়ে যেতো, কিন্তু ঠিক তার আগেই যুদ্ধটা গেল থেমে। মাইকেলের সঙ্গে বড়ো একটা দেখা হয় না গণেশের। দোকান নিয়ে বড়ো ব্যস্ত সে এখন। তাড়াতাড়ি কিছু পয়সা করতে না পারলে মান থাকবে না ডাফনীর কাছে।

অএল্ ডার্লিং, দোকানে বেরোবার আগে একদিন গণেশ বললো, কাম্ মাই শপ। অল্ ডে এলোন্। মাইণ্ড ক্রাই ফর্ ইউ।

সময় কোথায় প্রিয়তম? হেসে বললো ডাফনী, মাইকেল আর মাত্র দু' সপ্তাহ থাকবে লণ্ডনে, রোজ সে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

একটু গম্ভীর হ'য়ে গণেশ বললো, বাট্ আচবেণ্ড নট হোম্ ম্যান কামিং এট ওয়াইফ্, নট নাইস্ —

কথা শুনে ডাফনী গেল ক্ষেপে, কি, অপমান করছো তুমি আমাকে? এ কি তোমার ইণ্ডিয়া নাকি?

গণেশ তাড়াতাড়ি বললো, নো নো আই নট্ ইনচাণ্ট ইউ —

সে খুব লজ্জা পেলো মনে মনে। ছি ছি এমন ক'রে ডাফনীকে বলা তার মোটেই উচিত হয়নি। সত্যি এটা তো ভারতবর্ষ নয়। ঠিকই বলেছে ডাফনী। আর গণেশ তো এখন খাঁটী ইংরেজ। তাই তার স্ত্রীব ছেলে-বন্ধু এলে অমন কথা বলা তার সাজে না। এদেশে কোন স্ত্রীর নেই ছেলে-বন্ধু? এখানকার স্ত্রীরা কি ঘোমটা টেনে আড়ালে থাকে নাকি? গণেশ প্রতিজ্ঞা করলো মনে মনে যে এমন ভুল সে আব কখনও করবে না। কিন্তু খুব শীগগিরই প্রতিজ্ঞা মাথায় উঠলো তার। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তার শরীর খারাপ হওয়াব দোকান বন্ধ করে সে চ'লে এলো বাড়ী। কিন্তু ঘরে ঢুকেই প্রথমে হতভম্ব হ'য়ে গেল সে, তারপর রাগে মাথা থেকে পা অবধি কাঁপতে লাগলো তার। সে দেখলো সোফায় পাশাপাশি ব'সে আছে ডাফনী আর মাইকেল। চোখ তাদের বোজা আর এক হাত দিয়ে ডাফনী বেশ শক্ত ক'রে গলা জড়িয়েছে মাইকেলের। তারা দু'জনেই একেবারে তন্ময়। গণেশ যে এসে দাঁড়িয়েছে সে-ঘরে সেকথা তারা কেউ বুঝতেই পারলো না।

চীৎকার ক'রে উঠলো গণেশ, হোয়াট দিস্?

চমকে উঠলো দু'জন। গণেশকে দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাইকেল। কিন্তু নিজকে সামলে নিয়ে বললো ডাফনী, চেঁচাচ্ছ কেন তুমি?

আচ্‌বেণ্ড নট হোম্‌ ইউ টাচিং ম্যানস্‌ নেক্‌ ?

ও আমার বন্ধু, জানো না তুমি সেকথা ?

দিস্‌ নট ফ্রেণ্ড, ইউ লাইক্‌ আচ্‌বেণ্ড-ব্রাইড —

ব্যাপার দেখে মাইকেল বললো, আমি আসি ডাফনী।

না, ব'সো তুমি। দেখি আনকাল্‌চার্ড কালার্ড লোকটা কি করে। ডিভোর্স করবো আমি ওকে। একরকম জোর করেই মাইকেলের হাত টেনে আবার সোফায় বসালো ডাফনী, তারপর যেমন বসেছিলো তেমনি করে আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরলো।

চোখ লাল হয়ে গেছে গণেশের। সমস্ত শরীর থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে।

মাইকেলের সামনে এসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভাঙা গলায় সে বললো, গেট্‌ আউট হালার পো হালা —

চুপ করো, চেঁচিয়ে উঠলো ডাফনী।

এইবার এক আশ্চর্য কাণ্ড করলো গণেশ। বললো, লুক্‌, আই চিটাগং-সান্‌, ফিনিচ ইউ টু বাই নাইফ — ব'লেই ধাঁ ক'রে দেরাজ থেকে বের করলো ছোরা।

চট্টগ্রাম-সন্তানের দাপট দেখে যুদ্ধ ফেরৎ ইংরেজ-নন্দন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি — আমি যাই ডাফনী —

আর ইণ্ডিয়ানের হাতে ছোরা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো ডাফনী। ছুটে এলো আলি সাহেব আর তার স্ত্রী।

কি ব্যাপার, কি ব্যাপার ?

গণেশের হাতে ছোরা দেখিয়ে দিয়ে মূর্ছিতের মতো শুয়ে পড়লো ডাফনী।

গণেশ বললো, আই আউট এণ্ড দে টাচ নেক্‌ —

আরে ছি ছি, লম্বা চওড়া আলি সাহেব বেঁটে গণেশের কাছে থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, এরকম কেউ করে এখানে ? পুলিশের হাঙ্গামে পড়বে যে —

ডোণ্ট কেয়ার, সিন বৃস্লটন্‌ জেল।

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। মাইকেল তুমি আমাকে নিয়ে চলো এখুনি —

কিন্তু কোথায় মাইকেল! সুযোগ পেয়ে কখন সে স'রে পড়েছে কে জানে!

ডাফনী কিন্তু একাই চ'লে গেল একটু পরে। যাবার সময় ব'লে গেল গণেশকে, অমার্জিত ইণ্ডিয়ানকে এই অপমানের জন্যে উচিত শিক্ষা দেবে সে।

দাঁত কড়মড় ক'রে ব'লে উঠলো গণেশ, আই চিটাগং সান্‌, ইউ টাচ মাই রুমস্‌ উড এগেন, ফিনিচ ইউ বাই নাইফ —

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা সে তখন রাস্তায়।

আরে ছি ছি ভাই, গণেশকে শান্ত ক'রে বললো আলি সাহেব, বিয়েটা একটু দেখে শুনে করতে হয় তো! কতো রকম মেয়ে আছে এই লণ্ডন শহরে!

তার স্ত্রী বললো, ইংরেজ মেয়ে যে এরকম অভদ্র হয় তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

গণেশ তখন আলি সাহেবের হাতে সেই ছোরাটার দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা লক্ষ্য ক'রে হেসে বললো আলি সাহেব, ছোরা আর পাচ্ছ না তুমি ভাই, এটা নিয়ে চললাম আমি। নইলে যা মাথা গরম তোমার, কোনদিন হয়তো মেরে দেবে আমাকেই। হাঃ হাঃ হাঃ।

গণেশের ব্যাপারের বিস্তৃত খবর যথাসময়ে গিয়ে পৌছলো অল্ডগেটের সেই বাড়ীতে। একটা হাসাহাসির ধুম প'ড়ে গেল সেখানে।

ঠিক জব্দ হয়েছে বেটা, দীনবন্ধু বললো, শালার শ্বশুর সাহেব। বেটার দেমাক কতো! মর এবার সাহেব শ্বশুরের বাড়ী গিয়ে তুই —

রতন একবার গিয়েছিলো আলি সাহেবের বাড়ী। কিন্তু গণেশের কোন খবর দিতে পারলো না সে। সেই ব্যাপারের দু'দিন পর সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে বলতে পারে না আলি সাহেব। আর একদিন কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে রতন গিয়েছিলো গণেশের দোকানে। কিন্তু এখন একজন

ইংরেজ কিনে নিয়েছে তার দোকান। সেও কোন খবর দিতে পারলো না গণেশের।

কিন্তু কিছুদিন পর ইণ্ডিয়া হাউসের সামনে দিয়ে গটগট ক'রে গণেশকে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে ধরলো তাকে দীনবন্ধু, কিরে বেটা মেম বিয়ে করার সখ মিটেছে তো?

হোয়াট? একটুও লজ্জা না পেয়ে গণেশ বললো, আই ইংলিচ, নট নেটিব লাইক ইউ। ওয়াইফ কাম ওয়াইফ গো ফাইট ডিভোর্স ভেরি নেচারেল্ দিস্ কানট্রি।

উঃ বেটা ভাঙবে তবু মচকাবে না।

আই মেরি এগেন বাট কেয়ারফুল দিস্ টাইম। লুকিং লুকিং টু থ্রি দেন মেরি আই ইংলিচ—

থাম্ থাম্—

চাট আপ্ হালার পো হালা চাইলেণ্ট্—

তারপর আর কেউ দেখতে পায়নি গণেশকে লণ্ডনে। সে আবার বিয়ে করলো কিনা, কিংবা এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে কোথায় গেল, কেউ জানে না সে-খবর।

৯

অসুবিধা হয় শুধু চৌধুরীর। সব দিক থেকেই তার বড়ো মুস্কিল এখন। গরম পড়েছে হঠাৎ লণ্ডনে। ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম-সূর্যের মতো তেজ এখন লণ্ডন-সূর্যের। আজ আট দশ দিন ধ'রে উত্তাপ নিরানব্বুই ডিগ্রি। কী খুশী এদেশের লোক! প্রত্যেকের মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। ক্ল্যারা দিনের মধ্যে হাজার বার হাসিমুখে বলে, কী সুন্দর দিন! কতোদিন যে এমন দেখিনি আমি।

হাসা উচিত ব'লেই হয়তো হাসে চৌধুরী আর সায় দেয় ক্ল্যারার কথায়। কিন্তু আসলে প্রাণ বেরিয়ে যায় তার। এদেশে গরম একেবারেই সহ্য করতে পারে না চৌধুরী, শুধু হাঁসফাঁস করে সে। তবু যখন ক্ল্যারা বাড়ীতে ছিলো না, তখন এতো কষ্ট হোত না তার। খালি গায়ে খালি পায়ে শুধু একটা পায়জামা প'রে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতো সে, আর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মাঝে মাঝে ব'লে উঠতো, তারা তারা! এখন ক্ল্যারা রয়েছে এখানে, তাই এই গরমেও গরম ড্রেসিং গাউন প'রে ঘরে ব'সে থাকতে হয় তাকে। হয়তো শুধু প্যাণ্ট সার্ট পরতে পারলে কষ্ট কিছু কম হ'তো তার। কিন্তু সেদিক থেকেও হয়েছে বিপদ। ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে তার কাপড়-চোপড়। প্যাণ্ট প'রে ওভারকোট কিংবা ড্রেসিং গাউন না পরলে ছেঁড়া ঢাকা পড়ে না। তাই গরমে সারাদিন শুধু হাঁসফাঁস করে চৌধুরী আর অভ্যাস মতো সেই এক সুরে থেকে থেকে ব'লে যায়, তারা তারা! ওদিকে আরও একটা মুস্কিল হ'য়েছিলো তার। আর একটু হ'লেই ক্ল্যারা এলসীকে ছাড়িয়ে দিতো। খুব কায়দা ক'রে এক রকম জোর ক'রেই তার চাকরী বজায় রেখেছে চৌধুরী।

এলসীর সঙ্গে আজকাল আরও বেশী আলাপ হয়েছে তার। মালতীর সঙ্গে তার অনেক মিল। তাই তাকে দেখলে সান্ত্বনা পায় চৌধুরী, আর তার মনে পড়ে মালতীর কথা — কড়লার ক্ষুব্ধ তরঙ্গে অকালে হারিয়ে যাওয়া বউ তার। কতোই বা এলসীর বয়স কে জানে! হয় তো সতেরো কিংবা কুড়ি। মালতী যখন চ'লে যায় তখন তার বয়স কতো ছিলো? কতো বছর আগেকার কথা সে? সব ঠিক স্মরণে আসে না চৌধুরীর। তবু মনে হয় অনেক কথা। ব্রাহ্মণ চৌধুরী সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে জন্মান্তরে। আর এলসীকে যতবারই দেখে ততবারই তার সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মনে হয় এ যেন তারই সেই মালতী, অন্যরূপে আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু আজ তো সে তেমন ক'রে ধরা দেবে না। যাকে একদিন অন্ধ সংস্কারের তাড়নায় গৃহহারা ক'রেছিলো চৌধুরী, আজ তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাধনা করতে হবে তাকে — আগেকার দিনের মুনি-ঋষিদের মতো। আর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই তার। তারা তারা! ভগবানে মনপ্রাণ সঁপে দেয় চৌধুরী। কতোই ছলনা জানে তার দেবতা! কতো সমুদ্র ঘুরিয়ে তিনি বাড়ালেন তার জ্ঞান, দূর করলেন সংস্কার, তারপর আবার নতুন রূপে এনে দিলেন মালতীকে তার সামনে। তবু তার ভগবান তাকে কঠিন পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, যে মনে মনে সে একেবারে সংস্কার-মুক্ত কি না, মুনি-ঋষিদের বংশধর আসল ব্রাহ্মণ কিনা সে। আজ যদি আবার মালতীকে ঘরে ফিরিয়ে না নেয় সে, তাহ'লে নরকেও গতি হবে না তার। তাই যে-স্ত্রীর হাত একদিন অন্যলোক শুধু স্পর্শ ক'রেছিলো এই সামান্য অপরাধে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলো চৌধুরী, আজ সেই একই মানুষ তাকে এসে বলছে, আমার সঙ্গে বিয়ে হবে অন্যলোকের, তবু গ্রাহ্য করছে না কিছু চৌধুরী। কী কঠিন পরীক্ষা করছে কঠোর ভগবান! চৌধুরী হাসে মনে মনে। সে জানে জয় তার হবেই। এ বিধির বিধান। ভুল হবার উপায় নেই। অধৈর্য হ'য়ে সে শুধু বলে ওঠে, তারা তারা! তোমার লীলা কে বুঝবে মা!

সেই এলসীকে ছাড়িয়ে দিতে চাইলো ক্ল্যারা। বললো, শুধু শুধু এখন সপ্তাহে পাঁচ শিলিং খরচ করবার কি দরকার? মেডের কোন দরকার নেই, আমি একাই সব ক'রে নিতে পারবো।

কথা শুনে আশঙ্কায় শিউরে উঠলো চৌধুরী। সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখতে পায় সে এলসীকে। সেটাও যদি বন্ধ হ'য়ে যায় তাহ'লে সে বাঁচবে কেমন ক'রে! চাকরী চ'লে গেলে এলসী বোধহয় আর আসবে না এখানে।

না না, তা' কখনোই হয় না ক্ল্যারা।

কেন রে বিটলে? শালার দরদ কতো! বলি পয়সা দেবার নাম নেই একটাও, আর খরচ বাঁচাতে গেলে —

আমি দেবো এলসীর পাঁচ শিলিং সপ্তাহে।

এবেলা তোমার পয়সা আসে কোথেকে? বেটা সন্ন্যাসী-ঘুঘু ডুবে ডুবে জল খাও তুমি?

আঃ, করুণ স্বরে বললো চৌধুরী, দয়া-মায়া নেই তোমাদের একটুও? সকাল থেকে রাত্তির অবধি খাটে বিষ্টুর বউ। বিষ্টু নাই এখানে, নিশ্বাস ফেলবার সময় দেও না ওরে, এই কি বন্ধুর কাজ নাকি?

ঠিক বলেছিস বেটা বিটলে। বুদ্ধি আছে বটে তোর একটু। তারপর দীনবন্ধুই জোর ক'রে রাখলো এলসীকে।

সত্যি আশ্চর্য মেয়ে ক্ল্যারা। খুব অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বাড়ীর চেহারা ঘুরিয়ে দিলো সে। কাজ করে বেশী কথা বলে কম। ছেলেদের করতে দেয় না ঘরের কোন কাজ। হাসিমুখে একা একা সমস্ত কাজ ক'রে যায়। তার ওপর খোকাবাবুর ঘরে যথাসময়ে পৌঁছে দেয় চা কিংবা কফি।

আর মাঝে মাঝে বলে, খোকাবাবু একটু বাইরে বেরোও, এতো পড়লে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে যে?

হেসে উত্তর দেয় বঙ্কিম, সময় নেই। পরীক্ষা এসে গেল যে। তোমাদের বড়ো অসুবিধায় ফেলেছি, না?

কি যে বল! খোকাবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ল্যারা বলে, তোমার বাবা তোমার মতো ছেলেকেও অবিশ্বাস করে! কেমন দেশ তোমাদের?

একথায় জ্বলে ওঠে বঙ্কিম, তাই তো পাশ ক'রে বাবাকে দেখাতে চাই আমি। জানো ক্ল্যারা, আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা যে তোমাদের দেশে এলেই মানুষ নাকি খারাপ হ'য়ে যায়, মায়াবিনীর দেশ এটা।

তাই নাকি? কিন্তু তোমাকে তো চেনে তোমার বাবা।

তবু সেকেলে লোক। কে কি লিখে দিয়েছে তাই বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছেন।

কি আশ্চর্য! বঙ্কিমকে আর বিরক্ত না ক'রে স'রে যায় ক্ল্যারা। সে মনে মনে ভাবে হয়তো খুব বেশী ভুল করে না খোকাবাবুর বাবা। ছেলে দূরদেশে থাকলে সব বাপেরই অমন ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত বিষ্টুর বউ তো পুড়ে মরবার সময় তাই ভেবেছিলো, মায়াবিনীর দেশ এটা। কিন্তু সত্যি ক্ল্যারা জানতো না সেকথা। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তার স্বামীর আর একটা বউ আছে দেশে। জানলে কিছুতেই সে বিষ্টুকে বিয়ে করতো না। কিন্তু বিষ্টু তো তাকে বলেনি সেকথা একবারও। কেন বলে নি? স্ত্রীকে কি ভারতীয়রা এমনি ক'রেই প্রতারণা করে? আর কোন উপায় নেই এখন। বিষ্টুকে ভালোবেসেছে ক্ল্যারা। তাই তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তবু অনেকবার তার স্বামীকে একথা জিজ্ঞেস করেছে সে।

তোমার দেশের বিয়ের কথা আমাকে বলনি কেন?

হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, উত্তর দিতে পারেনি বিষ্টু।

তুমি আমাকে এমনি ক'রে ঠকালে কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার দেশের বউকে ভালোবাসি না।

কিন্তু আমাকে সেকথা আগে বল নি কেন?

আমাকে তাহ'লে তুমি বিয়ে করতে না —

কিন্তু আমি যদি এখন তোমাকে ছেড়ে যাই ?

আমি ম'রে যাবো ক্ল্যারা।

স্বামীর কথা শুনে অজানা ভয়ে ক্ল্যারার গা ছম ছম করে। তাড়াতাড়ি বিষ্টুকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলে, না না আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না—

বিষ্টু এখন তার স্বামী সেকথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না ক্ল্যারা। সে এখন কাছে নেই, তাই সব সময় ক্ল্যারা সংসার নিয়ে মেতে থাকে। ভুলে যেতে চেষ্টা করে স্বামীর অতীত — মুছে দিতে চায় যতো গ্লানি। কিন্তু রতন! আশ্চর্য মানুষ ব'লে তাকে মনে হয় ক্ল্যারার। যদিও দেখা বেশী হয় না তার সঙ্গে, কিন্তু যখন হয় মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকে রতন। ক্ল্যারা বুঝতে পারে তাকে শুধু এড়াতে চায় সে। বোধহয় বিষ্টুর স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্যে দায়ী করে তাকে। ক্ল্যারা জানে বিষ্টুর বিশেষ বন্ধু রতন। আর বিষ্টু তাকে বলেছে যে রতন তাদের বিয়েতে খুশী হয় নি মোটেও, আবার বিয়ে করেছে ব'লে অসন্তুষ্ট হয়েছে তার ওপর। কিন্তু তার কি দোষ ক্ল্যারা ভেবে পায় না কিছু। তার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই কোথায় যেন একটা মিল আছে। যে নির্দোষ তাকেই শুধু শাস্তি দিতে চায় লোকে। রতনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো ক্ল্যারা। কিন্তু কেমন ক'রে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পেলো না! তবু এক রাত্তিরে জেগে ব'সে রইলো সে রতনের জন্যে। তারপর রতন এলে বললো, আমার ঘরে একটু আসবে ?

অবাক হ'য়ে রতন বললো, কেন ?

তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবো।

এতো রাত্তিরে ? আমি বড়ো ক্লান্ত ক্ল্যারা।

আমিও। চা খাবে রটন্ ?

না। ধন্যবাদ।

এসো আমার ঘরে ··· ব'সো।

এ বাড়ীতে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ক্ল্যারা ?

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ক্ল্যারা বললো, না। আর হ'লেও তাতে তোমার কিছু যায় আসে কি ?

রতন উত্তর দিলো না। একটু আশ্চর্য হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। ক্ল্যারার ঘরের জানলা খোলা। গ্রীষ্মের হাওয়ায় উড়ছে তার সোনালী চুল। রতন হঠাৎ ভয় পেলো। সে আশঙ্কা করলো মহাসর্বনাশের। বার বার সে শুধু মনে করতে লাগলো ক্ল্যারা তার বন্ধুর বউ।

ক্ল্যারা, অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে না? কেউ দেখলে কি ভাববে ?

যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু এই রাত্তিরে মেয়ের ঘরে —

আমি মেয়ে নই, তোমার বন্ধুর বউ, মহিলা।

আশ্বস্ত হ'য়ে রতন বললো, আমাকে মাপ কর ক্ল্যারা। বল, কি বলতে চাও তুমি ?

তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না কেন ?

কেন বলবো না ?

আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ কর না।

আরে ছি ছি, একি বলছ তুমি ! আমার যে সময় নেই একেবারে —

ও তোমার মিথ্যা কথা। আমি জানি বিষ্টুর বউএর পুড়ে মরবার জন্যে তুমি দায়ী কর আমাকে।

ঘাবড়ে গিয়ে রতন বললো, না না —

কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না সেকথা। বিষ্টু আমাকে একবারও বলেনি যে তার বিয়ে হয়েছে। একথা জানলে আমি কখনো বিয়ে করতাম না তাকে।

কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছো কেন ক্ল্যারা ?

কারণ আমি চাই আমার ওপর কোন রাগ রাখবে না কেউ।

আমার রাগ নেই তো তোমার ওপর।

কিন্তু আমার স্বামীর ওপর তো আছে।

বিষ্টু বলেছে তোমায় সেকথা ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তা'তে কি যায় আসে তোমার ক্ল্যারা ?

যথেষ্ট যায় আসে। সে আমার স্বামী। আমার স্বামীর ওপর কাউকে কোন রাগ রাখতে আমি কিছুতেই দেবো না।

কিন্তু তার দেশের লোক ? তার আত্মীয়-স্বজন ?

তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বিষ্টুর হ'য়ে ক্ষমা চাইবো আমি।

অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলো রতন, আমাদের দেশে যাবে তুমি ?

আমার স্বামীর দেশে নিশ্চয়ই যাবো। সকলকে গিয়ে বোঝাব, ছেলেবেলায় বিয়ে হ'য়েছিলো বিষ্টুর, ভালোবেসে সে বিয়ে করে নি, বাপ মা জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিলো তার। তাই আমাকে ভালোবেসে বিয়ে ক'রে কোনো অন্যায়ই সে করে নি। ওর দিশি বউএর মৃত্যুর জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। কেন সে ভালোবাসলো না অন্য কাউকে ? কেন সে আবার বিয়ে করলো না ? সে বোকা তাই পু'ড়ে মরলো — একথা আমি তোমাদের দেশে গিয়ে বলবো প্রত্যেককে।

ক্ল্যারার কথা শুনে রতন হাসলো মনে মনে। ভাবলো, ইংরেজ মেয়ে ক্ল্যারা, কেমন ক'রে সে বুঝবে যে সতী লক্ষ্মী বাঙালী মেয়ে এক স্বামী ছাড়া কথায় কথায় ভালোবাসতে পারে না অন্য কাউকে। তাই স্বামী ভালো না বাসলেও অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না তারা। জ্বলে পুড়ে সেই বিয়ে করা এক স্বামীকে সুখী করবার জন্যে দরকার হলে হাসতে হাসতে প্রাণও দিতে পারে।

খোকাবাবু তখনো একস্বরে প'ড়ে যাচ্ছে জোরে জোরে। তার কথার একবর্ণ বুঝতে না পারলেও স্পষ্ট ওদের কানে এলো তার গলার স্বর।

সেই থেকে রতনের আর কোনো রাগ নেই ক্লারার ওপর, আর বিট্টুকেও সে ক্ষমা ক'রে ফেললো মনে মনে। তবু মাঝে মাঝে তার শুধু মনে পড়ে একটি বাঙালী মেয়ের দগ্ধ শরীর। সেই পোড়া দেহটাকে কি আবার পুড়িয়েছিলো তার আত্মীয়-স্বজন? যতো ভাবে পরের কথা আর কখনও ভাববে না, তবু অনেক সময় পরের ভাবনায় ঘুম হয় না রতনের।

গ্রীষ্মকালে রতনের বড়ো বেশী মনে পড়ে দেশের কথা। সকালে হোটেলে আসবার সময় টিউবে ব'সে সে ভাবে যে এটা যেন ভারতবর্ষের রেলগাড়ী। বঙ্গে থেকে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। গোয়ালন্দ থেকে স্টীমার ধ'রে সে যাবে চাঁদপুর। তারপর সেখান থেকে সটান্ নোয়াখালী। টিউব ট্রেন হ'য়ে দাঁড়ায় নোয়াখালীর সেই গাড়ী। আর ঘড়ি দেখে মনে মনে সময় হিসেব করে। এখন দেশে বেজেছে বেলা সাড়ে বারোটা। কি করছে সোনা বউ। নিশ্চয়ই রান্নাঘরে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে বাতাস খাচ্ছে হাত পাখা নিয়ে। কি রান্না করেছে আজ সে? ডাল, পুঁই শাক আর আলুর চচ্চড়ি। দূরে কোকিল ডাকছে। করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে ভোলা বৈরাগী। পেয়ারা গাছে উড়ে এসে এই মাত্র বসলো দু'টো বুলবুলি। শালিখের দল জটলা করছে উঠোনে। কুঁড়ে ঘরের চালে কাক সমানে ডেকে চলেছে কা কা কা —

মাইণ্ড দি ডোরস্! হেঁকে ওঠে টিউবের গার্ড। চমকে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখে রতন টেম্পল স্টেশন। এর পরের স্টেশনে বদলাতে হবে তার ট্রেন।

এক একবার মনে হয় রতনের এই মুহূর্তে চ'লে যায় দেশে। আর ভালো লাগে না তার এখানে। সেই রঙ মাখা মেয়ে আর কাঠের পুতুলের

মতো ফিটফাট ছেলের দল! সেই পায়ে পা লাগলে 'সরি' আর কথায় কথায় যন্ত্রের মতো 'থ্যাঙ্ক ইউ', ওজন ক'রে আস্তে আস্তে কথা বলা আর মেপে মেপে সাবধানে চলা ফেরা আর একদিনও ভালো লাগে না তার। তবু তাকে যেতে হয় ইণ্ডিয়া গ্রীলে, তেমনি ক'রেই ছুটাছুটি করতে হয়। ভূপালের সঙ্গে রেস্তোরাঁর আলোচনা আর আইলীনের সঙ্গে রসিকতা ক'রেই দিন কেটে যায় তার। না, আর নয়, এবার থেকে অন্তত পাঁচ শিলিং ক'রেও সে জমাবার চেষ্টা করবে রোজ। তাহ'লে তার দেশে ফেরবার ভাড়ার টাকা উঠে যাবে।

মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে হ'য়ে যখন বড়ো বেশী মন খারাপ হয় তখন কাজে মন দিয়ে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করে রতন।

গম্ভীর হ'য়ে ভূপালকে বলে, কিছু খেয়াল আছে নাকি আপনার মল্লিক সাহেব? ওদিকে পিকাডিলিতে আর এক বাঙালীবাবু দোকান খুলেছে যে। আমাদের থেকে দাম কিছু কম সেখানে। লোকে সেখানেই যাচ্ছে সব আজকাল। দেখতে পান না আপনার দোকানে কতো ভীড় ক'মে গেছে —

তা' তুই বল রতন কি করি আমি? আমার দোকানের সব ভার তো তোদেরই ওপর ছেড়ে দিয়েছি। নে না, দাম বদলে নতুন মেনু তৈরী কর — যা' ইচ্ছে হয় কর তুই —

ব্যস্ত হ'য়ে মেনু নিয়ে নতুন দাম বসায় রতন। আইলীন তার কাছে এসে বলে, বড়ো সীরিয়াস হ'য়ে যাচ্ছো তুমি রটন। রতন হাসে, কথার উত্তর দেয় না।

ভূপাল ডাকে আইলীনকে, এখন বিরক্ত ক'রো না ওকে আইলীন, দোকান উঠে যাবে তা'হলে, পাশেই নতুন দোকান হয়েছে যে, দাম সেখানে অনেক কম।

রতনকে বিশ্বাস করে ভূপাল।

সেপ্টেম্বার মাসে মাস কয়েকের জন্যে দেশে যাচ্ছে ভূপাল। ঠিক পুজোর

সময় গিয়ে পৌঁছতে চায়। টমাস্ কুকে প্যাসেজ বুক করেছে সে। জিনিসপত্র এখন থেকেই কেনা কাটা আরম্ভ করেছে কিছু কিছু।

তুমিও যাচ্ছো নাকি আইলীন? রতন জিজ্ঞেস করলো।

কোথায়?

জানো না, ভূপাল দেশে যাচ্ছে? তুমি যাবে নাকি ওর সঙ্গে?

না, আমি যাচ্ছি না। ও তো যাচ্ছে মোটে কয়েক মাসের জন্যে, তারপর আবার চ'লে আসবে এখানে, আর যাবে না। আমরা দু'জন এখানে একসঙ্গে থাকবো।

আর আমি?

তুমি? আইলীন বললো, তোমাকে আমি ক্যাশিয়ার ক'রে নেবো আমাদের, — খুশী?

খুব।

ভূপালের যাওয়ার উদ্যোগ দেখে মন খারাপ হ'য়ে যায় রতনের। বলে আমাকেও নিয়ে চলো মল্লিক সাহেব, ফিরে এসে চাকরী ক'রে ধার শোধ ক'রে দেবো তোমার।

দূর পাগল, তুই গেলে আমার দোকান চালাবে কে? তুই আর আইলীন তো ভরসা। আইলীন একা পারে কখনও!

মাঝে মাঝে ভূপালকে ভারী ভালো লাগে রতনের।

১০

এলসী তাহ'লে শেষ অবধি থেকেই গেল। শুধু দিন গোনে চৌধুরী — আর কতোদিন আমাকে এ কঠোর পরীক্ষায় রাখবে মা — কতোদিন আর এমনি ক'রে কঠিন শাস্তি দেবে। আমরা কে, সব তোমারই ইচ্ছা, তারা — তারা !

আজকাল এলসীর সঙ্গে নির্জনে কথা বলা একেবারেই হ'য়ে ওঠে না চৌধুরীর। বড়ো কঠিন কর্ত্রী ক্ল্যারা। সে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে নেয় এলসীকে দিয়ে। এটা পরিষ্কার করো, ওটা সরাও, সেটা আরও ভালো ক'রে পালিশ করো — এমনি আরও অনেক ফরমায়েশ। বেচারীর মুখ দেখে দুঃখে বুক ভেঙে যায় চৌধুরীর। সে ছুটে এসে যথাসম্ভব সাহায্য করে তাকে। ক্ল্যারাকে বলে, আহা ও ছোটো মেয়ে, অতো পরিশ্রম করতে পারে কখনও ! ক্ল্যারা কি ভাবে কে জানে, সে কিছুক্ষণের জন্যে স'রে যায়। আর তখুনি কথা বলবার সুযোগ পায় চৌধুরী। বাড়ীতে আর কেউ নেই। শুধু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে খোকাবাবু প'ড়ে যাচ্ছে এক মনে।

চৌধুরী এলসীর কাজে এগিয়ে এসে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। তারপর ডাকে, মালতী ?

ফিক্ ক'রে হেসে এলসী বলে, ওর মানে কি ?

সেই আমার দেশের মেয়ে যে আমাকে ভালোবাসতো, তার নাম মালতী। তুমিই তো সেই মেয়ে মালতী —

আবার হেসে এলসী বললো, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।

আমি জানি, বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় চৌধুরীর।

ক্ল্যারা কে ? ওকে আমার একটুও ভালো লাগে না, তোমার বউ বুঝি ?"

দুর, ও আমার বন্ধুর বউ। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার বউ হ'তে পারে কখনও ?

সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

চৌধুরী তার হাত ধ'রে বলে, তুমি আমার বউ।

এলসী ঝাঁটা তুলে নিয়ে চৌধুরীকে চুমু খেয়ে বলে, প্রিয়তম !

তারা তারা, আর কতোদিন এ পরীক্ষায় রাখবে মা !

আকুল আগ্রহে শুধু দিন গোনে চৌধুরী। কবে তাকে এলসী এসে বলবে, তুমি আমার স্বামী, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাবো গো !

যদি এই জন্মান্তরের কথা, মালতীর সঙ্গে মিলের সমস্ত কাহিনী চৌধুরী এলসীকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারতো তাহ'লে হয়তো তাকে ফিরিয়ে আনা একটু সহজ হ'তো, তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শেষ হ'তো তার। কিন্তু অতো কথা গুছিয়ে বলবার মতো ইংরেজী বিদ্যা চৌধুরীর নেই।

তবু সে জিজ্ঞেস করে, এলসী, টেমস্ নদী দেখেছো তুমি ?

ওমা লণ্ডনে থেকে টেমস্ নদী দেখবো না ?

মনে মনে কথা সাজিয়ে একটু ভেবে বলে চৌধুরী, আচ্ছা তোমার কি কখনও মনে হয় না যে অন্য কোন দেশ থেকে ওই টেমস্ নদীতে ভেসে এ দেশে এসেছো তুমি ?

অবাক হ'য়ে এলসী বলে, এই দেখ ! সব পুরুষই যে একরকম কথা বলে ! আমার কিঁয়াসে জিমও ঠিক অমন কথা বলে গো। সে আমার হাত চেপে ধ'রে বলে চলো ওই নদীতে ভেসে আমরা অন্য কোনো দেশে চ'লে যাই —

তারা তারা, তাড়াতাড়ি এলসীর হাত ধ'রে ব'লে ওঠে চৌধুরী, আর কতো কঠিন শাস্তি দেবে মা।

বর্ষা নামলো হঠাৎ লণ্ডনে। সারাদিন টিপ টিপ বৃষ্টি। কখনও ঘণ্টা

কয়েকের জন্যে থামে, মুখ বাড়ায় ম্লান সূর্য, তারপর আবার যে কে সেই। ক'দিন থেকে বাজও পড়ছে ঘন ঘন। এমনি এক সজল দিনে চৌধুরীর কাছে ফিরে এলো মালতী। পরীক্ষা শেষ হ'লো তার, ধরা দিলো এলসী। কাগজে বেরিয়েছে টেমস্ নদীতে জোয়ারের জোর আজ খুব বেশী। কড়লা যাকে হরণ ক'রেছিলো টেমস্ তাকে ফিরিয়ে দিলো।

সেই ম্লান অপরাহ্নে দু'হাত বাড়িয়ে এলসীকে কাছে টেনে নিয়ে বললো চৌধুরী, আমি জানতাম আমার কাছে তুমি একদিন আসবেই —

কিন্তু জিম্ এতো বড়ো পাজি দেখ, শেষে গায়ে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বলে, তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে চাই না আমি।

তারা তারা, সব তোমারই ইচ্ছা! এলসীকে বললো চৌধুরী, আমি ছাড়া আর কারুর হ'তে পারো তুমি কখনও!

কিন্তু তার সঙ্গে আমার বিয়ের সমস্ত ঠিক ছিলো যে —

তা থাক তা থাক, শক্তি দাও মা, মনে বল দাও, কিন্তু দেখ ভগবানের লীলা, শেষ অবধি আমি তোমাকে পেলামই। তোমার জন্যে কতোদিন পথ চেয়ে ব'সে আছি আমি।

উঃ, এলসী আবার বললো, এতো বড়ো শয়তান জিম্, স্বামী স্ত্রীর মতো আমরা বাস করলাম এক বছর, আর এখন বলে কিনা বিয়ে করতে চাই না তোমাকে —

ঠিকই বলে সে, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বললো চৌধুরী, এ ভগবানের বিধান এলসী, আমার সঙ্গে ছাড়া কারুর সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না তোমার।

সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

উত্তর না দিয়ে এলসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো চৌধুরী। আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তার মুখ। একবার নিজের মনের ভেতর তলিয়ে আগাগোড়া দেখলো সে। না, এলসীকে গ্রহণ করতে তার মনে আজ আর এক বিন্দু সঙ্কোচ নেই। দূরে পর পর কয়েকটা বাজ পড়লো।

তারই শব্দে চমকে উঠলো ওরা দু'জন। আর সেই সময় সে-ঘরে ঢুকলো দীনবন্ধু। ওদের ও ভাবে দেখে 'সরি' ব'লে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু এলসীকে তেমনি ক'রেই ধ'রে রেখে ডাকলো চৌধুরী, দাঁড়াও, শুনে যাও দীনবন্ধু, এলসীকে বিয়ে করবো আমি, তোমাদের আপত্তি নাই তো কোনো? দীনবন্ধুকে দেখে একটু লজ্জা পেলো এলসী। আস্তে আস্তে চৌধুরীর হাত ছাড়িয়ে ঝাঁটা নিয়ে গেল বাকী ঘরগুলো পরিষ্কার করতে।

হ্যারে বিটলে? হেসে বললো দীনবন্ধু, তাই ছুঁড়ির চাকরী বজায় রাখবার জন্যে অতো সখ তোমার? বামুনের ছেলে ম্লেচ্ছকে বিয়ে না করলে ঘুম হবে কেন?

ও আমার গত জন্মের বউ।

থাম্ থাম্, খালি বড়ো বড়ো কথা মুখে। কিন্তু দু'টোতে মিলে যে গাণ্ডে পিণ্ডে গোগ্রাসে গিলবে আমাদের ঘাড় ভেঙে সেটি হবে না। বিয়ের পর পয়সা দিতে হবে তোমায় তা' আমি আগে থেকে ব'লে দিলাম।

বিয়ের পর এখানে তো আমরা থাকবো না দীনবন্ধু।

তবে যাবে কোথায় শুনি? গণশার মতো সাহেব শ্বশুর নিয়ে কলা দেখাবে নাকি আমাদের?

আরে না না, দেশে ফিরে যাবো।

উঃ, পেটে পেটে হাত পা তোমার বিটলে, বাস্তু-ঘুঘু তুমি। কতো টাকা আছে তোমার বাছাধন বল দেখি হলপ ক'রে?

কিন্তু চৌধুরী কিছু বলবার আগেই সে-ঘরে এলো ক্ল্যারা। একগাল হেসে তাকে চৌধুরীর বিয়ের খবর দিলো দীনবন্ধু। আর তারপর বাড়ীময় সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

দেশে যে আবার এমনি ক'রে যাবে সেকথা কোনদিনও কল্পনা করেনি

চৌধুরী। মনের জালায় দেশ ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছিলো সে। দুর সমুদ্র পারের দেশ তাকে দিলো শান্তি। আজ সে তৃপ্ত। তার বিদেশের কাজ শেষ। তারই হারিয়ে যাওয়া মালতীকে নতুন রূপে সঙ্গে নিয়ে আবার সে ফিরে যাবে দেশে, আবার সাজিয়ে তুলবে তার মনিহারী দোকান। এবার বড়ো বড়ো ক'রে ইংরেজীতে টাঙাবে সাইন বোর্ড। তা'তে লেখা থাকবে, ইংল্যাণ্ড রিটার্ণ্ড স্টেশনার্স। ভীড় কিছু বেশী হবে তার দোকানে, আর দাম একটু বেশী করলেও খদ্দের আপত্তি জানাতে সাহস পাবে না। এখন তার আর কোনো লজ্জা নেই, স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দোকানে ব'সে থাকবে সে। হয় তো তার মেম বউ দেখবার জন্যে ভীড করবে ছেলেমেয়ের দল। অবাক হ'য়ে তারা তাকিয়ে থাকবে এলসীর মুখের দিকে। তাদের তাড়া দিয়ে বলবে চৌধুরী, যা যা ছোকরারা, দেখিস কি হাঁ ক'রে? কিন্তু তারা স'রে যাবে না, তেমনি ক'রেই দেখবে এলসীকে। আর গোঁড়া আত্মীয়রা আজও যারা বেঁচে আছে হয় তো অভিশাপ দেবে তাকে—এলসীকেও তারা পছন্দ করবে না। কিন্তু তবুও মুখ ফুটে বলতে পারবে না কিছু, ইংরেজী বলবার ভ'য়ে তারা যতদূর পারে এড়িয়ে চলবে এলসীকে। ভাবনা হ'লো চৌধুরীর, কেমন ক'রে তার সেই আত্মীয়দের বোঝাবে সে—এ এলসী নয়, এ ইংরেজ বউ নয়, কেন তোমরা চিনতে পার না একে? এ আমার সেই মালতী। ভগবান আবার তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। যাকে হারিয়ে দেশ ছাড়লাম, তাকে ফিরিয়ে আবার নিয়ে এলাম ঘরে। তা'তে যদি না বোঝে তারা, তা'হলে গ্রাহ্য করবে না কিছু সে। কার ধার ধারে আর চৌধুরী? সত্য ছাড়া আর কিছু জানে না সে। পরের দেয়া অর্থহীন অপবাদের জন্যে আজ আর নিরপরাধ এলসীকে সে দেবে না কোন সাজা। তার জন্ম-জন্মান্তরের এলসী — তার মালতী। আজও হয় তো সেই তিস্তা ঠিক তেমনি ক'রে থেকে থেকে গর্জন তোলে। কিন্তু সে শব্দে আর চমকে উঠবে না চৌধুরী, ঘুমহীন হবে না তার রাত। এলসীকে পাশে

নিয়ে হাসিমুখে দোকান চালাবে সে। তারা তারা — কে বুঝবে তোমার লীলা মা, সব তোমারই ইচ্ছা!

দু'দিন বাদে তুমি বাড়ীর বউ হবে, হেসে ম্যারা এলসীকে বললো, এখনও পাঁচ শিলিং দিতে হবে নাকি তোমায়? তাকে আর বেশী কাজ করতে দেয় না সে, নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করে।

পয়সা চাই না আমি। চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো এলসী, ইণ্ডিয়ায় আমায় নিয়ে যাবে কবে?

বিয়ে হ'য়ে যাবার পরই। এদেশে আর থাকতে ভালো লাগে না আমার।

শীগগিরই বিয়ে হবে চৌধুরীর। খুব ভালো আয়োজন করবে এরা। বিয়ে হবে এ বাড়ীতেই, আর খাওয়া দাওয়া হবে ভূপালের দোকানে। চেনা শোনা সব বাঙালী বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা হবে। বিয়েটা হিন্দুমতেই করবার ইচ্ছে চৌধুরীর। এখন থেকেই তাই সুরু হ'য়ে গেছে নানা আয়োজন। খুব খুশী হয়েছে রতন। বন্ধু বান্ধবের বিয়ের নেমন্তন্ন সে যে কতোদিন খায়নি তার ঠিক নেই। পাশেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে এলসী থাকে। অনাথ আশ্রমে মানুষ। মা বাবা কিংবা আত্মীয় স্বজন কাউকেই চেনে না সে। কিন্তু তা'তে কিছু যায় আসে না। সমস্ত বন্দোবস্ত রতন ঠিক করে ফেলেছে এরই মধ্যে। এলসীকে সম্প্রদান করবে দীনবন্ধু।

স্বভাব গেল না আজও দীনবন্ধুর। রতনের কথা শুনে সে গালে হাত দিয়ে বললো, বুড়ো বিটলেটাও আমার ঘাড়ে ভর ক'রে পার হবে রে?

অমন ক'রে কথা ব'লো না, ধমক দিয়ে বললো রতন, বিদেশে দেশের ছেলের উপকার আমরা না করলে কে করবে?

উপকার? বলি একটা কচি ছুঁড়িকে ওই বুড়ো মিন্সের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার কি চোদ্দপুরুষের উপকার করবি রে তোরা?

আঃ চেঁচাও কেন দীনদা, খোকাবাবু আছে বাড়ীতে খেয়াল নেই? বয়স হ'লো, এবার একটু মুখ সামলাও।

খোকাবাবুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলো দীনবন্ধু।

ভালো জিনিস কিছু কম দামে পাওয়া যাবে ব'লে ওরা একদিন এলো আলি সাহেবের বাড়ী ক'নের জন্যে একটা নেকলেস কিনতে। চাঁদা ক'রে রতন আর দীনবন্ধু দাম চুকিয়ে দেবে।

কিন্তু দাম বলতে চায় না আলি সাহেব। বলে, দেশের ছেলের সাদি, ব্যবসা করতে পারি তোমাদের সঙ্গে ?

না না, জোর করে রতন, এমনি করলে নেকলেস নিতে পারবো না আমরা।

হো হো ক'রে হেসে আলি সাহেব বলে, নিও না।

কিন্তু দীনবন্ধু প্রচুর অনিচ্ছা দেখিয়ে আস্তে আস্তে তুলে নেয় নেকলেস। বাইরে বেরিয়ে বলে, ওরে লক্ষ্মী আমাদের ঘর ছেড়ে যাবে না। আর তোকেও তো বলিহারী, লোকটা নেবে না দাম তবু জোর করা কেন ? দে না, দে না আমাকে পাঁচটা শিলিং ? সে বেলা বেটা হুঁসিয়ার। ও ছাতার কয়েক পাউণ্ডে কি হয় আলির ? অনেক পয়সা ওর। তেলো মাথায় তেল ঢেলে কোনো লাভ নেই, বুঝলি বেটা গাধা ?

বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেছে। অধৈর্য হ'য়ে শুধু দিন গোনে চৌধুরী। বিয়েটা তাহ'লে খুব ঘটা ক'রেই হবে তার !

দিন কয়েক পর হঠাৎ অসময়ে এলো এলসী। চৌধুরী বাড়ীতেই ছিলো তখন। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না ক'রে এলসী দেখা করলো ক্ল্যারার সঙ্গে। ক্ল্যারা তাকে জানালো চৌধুরী ঘরেই আছে।

না, আমার দরকার তোমার সঙ্গে, ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে এলসী বললো, সেই যে একদিন কাজ করেছিলাম — এ বাড়ীর বউ হব ব'লে পয়সা দাওনি তুমি, সে-পাঁচ শিলিং নিতে এলাম আজ।

ক্ল্যারা অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই এলসী ব'লে গেল

আবার, ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করতে আমার দায় পড়েছে। বড় নোংরা ওরা। ইংরেজ হ'য়ে তুমি ওদের সঙ্গে এ বাড়ীতে থাকো কেমন ক'রে ?

· কি বলতে চাও তুমি ? শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো ক্ল্যারা।

এলসী চাপা স্বরে আস্তে আস্তে বললো যে জিম আবার ফিরে এসেছিলো তার কাছে। বড়ো অনুতপ্ত বেচারা। ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করবে শুনে নাক সিঁটকে বললো যে এলসী বড় বোকা, বিদেশীকে ইংরেজ মেয়ের কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়। জিমই তাকে বিয়ে করবে। এই কথা বলতেই এসেছে এলসী আজ। আর সেই পাঁচ শিলিংএরও তার বড়ো দরকার, সেটাও চাই এখুনি।

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে সব কথা ব'লে যাও —

না, আমার অতো সময় হবে না এখন ওর সঙ্গে বকর বকর করবার। তুমি ব'লে দিও ওকে এক সময়। জিম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। হ্যাঁ, আর আমি কাজ করতে আসবো না এখানে —

ক্ল্যারার কাছ থেকে পাঁচ শিলিং নিয়ে এলসী চ'লে গেল।

মিঃ চাড্‌রী ? খুব আস্তে চৌধুরীর ঘরে টোকা দিয়ে ডাকলো ক্ল্যারা।

কিন্তু চৌধুরীর কানে গেল না সে আওয়াজ। তার চোখের সামনে তখন জলপাইগুড়ির আমবাগান — দূরে ছবির মতো অস্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা আর করলার ছলোছলো কালো জল। পাশেই তার মনিহারী দোকান। সেখানে ঝুলছে বিরাট সাইন বোর্ড —

মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী
ইংল্যাণ্ড রিটার্ণ্ড স্টেশনার্স

আর থেকে থেকে তিস্তার তরঙ্গ থেকে শব্দ ভেসে আসছে — গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

১১

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এস্ এস্ অ্যালক্যানটারা জাহাজে ভূপাল মাস কয়েকের জন্যে দেশে ফিরে গেল। তার স্ত্রী বিশেষ ভাবে লিখে-ছিল এ বছর পুজোর সময় তাকে থাকতেই হবে তার পাশে। লণ্ডনের শীত এড়াতে ভূপালও চেয়েছিলো এ বছর। ফিরে আসবে আবার সে গ্রীষ্মকালে, সেই মে-জুন মাসে। ততোদিন রতন আর আইলীনকে চালাতে হবে রেস্তোর্ঁা। মেরী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তবু ইচ্ছে ক'রেই নতুন লোক রাখলো না ওরা।

যাবার আগের দিন রাত্তিরে বড়ো কান্নাকাটি করেছিলো ভূপাল। অনেকবার নাকি যাওয়া নাকচ ক'রে দিতে চেয়েছিলো। আইলীন বলে রতনকে, আমি বললাম, না যাও তুমি, আমার কথা তোমাব স্ত্রীকে খুলে বল সব। তারপর আবার ফিরে এসো, তখন আমরা দু'জন চিরকালের জন্যে থাকবো এক সঙ্গে।

রতন কিন্তু এসব কথা কিছু জিজ্ঞেস করে না আইলীনকে। এখন তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই একেবারে। ভূপাল যখন বিশ্বাস ক'রে সমস্ত ভার দিয়ে গেছে তার ওপর তখন একচুল এদিক ওদিক হ'তে দেবে না সে। যদি এই ক'মাসে রেস্তোর্ঁার আয় বাড়িয়ে দিতে পারে তাহ'লেই সার্থক হবে তার পরিশ্রম। ভূপাল ফিরে এসে দেখুক, ইচ্ছে করলে রতন কি না করতে পারে। রোজ আসে সে খুব সকালে, রবিবারও বাদ যায় না। ভোর সাড়ে ছ'টায় চৌধুরী তাকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

কিন্তু চৌধুরীর কি যে হ'য়েছে ক'দিন থেকে, ভেবে পায় না রতন।

একটা সামান্য মেয়ের জন্যে অমন ভেঙে পড়ে নাকি মানুষ। চোখ ব'সে গেছে চৌধুরীর। ভালো করে খায় না সে আজকাল। শুধু দিন রাত শুকনো মুখে গালে হাত দিয়ে ব'সে কি যেন ভাবে। থেকে থেকে আর বলে না, তারা তারা!

একটা মেয়ে গেছে তো কি হয়েছে? ছোট ছেলে নাকি তুমি অ্যাঁ? অমন কতো জুটবে লণ্ডন শহরে —

শালার বুড়োকে ধেড়ে রোগে ধরেছে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, এখনো বিটলের টোপর প'রে বর সাজবার বাসনা।— দীনবন্ধু ফ্যা ফ্যা ক'রে হাসে।

সান্ত্বনা দেয় ক্ল্যারা, আমি তোমার জন্যে মেয়ে দেখে দেবো। আমাদের শহরের মেয়েরা লণ্ডনের মেয়েদের মতো এমন ক'রে মানুষকে ঠকাতে জানে না। অমন ক'রে থেকো না চৌধুরী, ওঠ, যাও একটু বেড়িয়ে এসো —

কিন্তু সে সব কথা চৌধুরীর কানে যায় কি না বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি ক'রেই ম্লান মুখে ব'সে থাকে সে। বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পারছে চৌধুরী, দিনে দিনে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। ক্লান্তি আসে, মাথা ঘোরে, একটুতেই হাঁপ ধরে। এমন হ'লে আর হয়তো বেশীদিন বাঁচবে না সে। কিন্তু আর বাঁচতে চায় না চৌধুরী। ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছে সে — চুরমার হ'য়ে গেছে তার সোনার স্বপ্ন। এ কি করলে মা! মালতীকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার এমন ক'রে হরণ করলে কেন? এ কেমন লীলা তোমার! চৌধুরীর এতোদিনের বিশ্বাস গোলমাল হ'য়ে যায়। তবু প্রাণপণে ভগবানকে ডাকবার চেষ্টা করে সে, শক্তি দাও, তারা তারা। গলা দিয়ে স্বর বার হয় না তার। হয়তো আরও কঠিন পরীক্ষা সুরু হয়েছে। হয়তো বিয়ের পর মালতী আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে তার কাছে। ঠিক ঠিক, চৌধুরী বলতে চেষ্টা করে, তারা তারা। ভগবান সবই করছেন মিলিয়ে মিলিয়ে। বিয়ের পরই তো মালতীকে সে গৃহহারা

করেছিলো — কুমারী অবস্থায় সে ফিরে আসবে কেমন ক'রে! ঠিক ঠিক, সে ফিরে আসবে বিয়ের পর। আর যে-সন্তান মালতীর পেটে ছিলো সেই সন্তান বুকে ব'য়েই তো ফিরে আসতে হবে এলসীকে। দু'হাত বাড়িয়ে তখনি তাকে ঘরে তুলে নেবে চৌধুরী। তারা তারা! তোমাতে বিশ্বাস রাখতে দাও মা — মনে বল দাও! তবু চৌধুরীর চোখের সামনে যেন অন্ধকার নামে। কিছুতেই আর ভগবানে বিশ্বাস রাখতে পারে না। খুব ভোরে যখন রতনকে ডেকে তোলে তখন জোর ক'রে গলা দিয়ে স্বর বের করতে হয় তাকে।

অনেক দিন পর রতনের নামে বিষ্টুর চিঠি এলো একদিন। বিয়ের পর এই প্রথম চিঠি বিষ্টুর। অনেক কথা লিখেছে সে — লম্বা চিঠি। খুব ছোটো ছোটো অক্ষর। পড়তে অনেক সময় লাগলো রতনের।

এতোদিন লজ্জায় সে লিখতে পারে নি রতনকে। মেম বিয়ে ক'রে আগেকার বউকে পুড়িয়ে মারার জন্যে রতনের কাছে আজও বিষ্টু খুবই লজ্জিত। আজও মাঝে মাঝে দুর্গার কথা মনে ক'রে চোখের জল ফেলে সে। রতন কি একথা বিশ্বাস করবে? এই এক কথাই অনেক বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছে বিষ্টু। আরও লিখেছে, ক্ল্যারার কোনই দোষ নেই, দুর্গার চেয়েও হাজার গুণে ভালো মেয়ে সে। রতন তার সে পরিচয় এতো-দিনে বেশ ভালো ভাবেই পাচ্ছে নিশ্চয়। দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তো বিষ্টুর। কাজেই ক্ল্যারার ওপর যেন কোন রাগ না রাখে রতন। যা হ'য়ে গেছে তা'তো হ'য়ে গেছেই — তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন আর লাভ কি? দুর্গা তো আর ফিরে আসবে না। তাই সব ভুলে ক্ল্যারাকে নিয়ে সুখী হ'তে চায় বিষ্টু। দেশের মেয়ের মতো শান্ত-শিষ্ট ভালো মেয়ে ক্ল্যারা। এখন যদি রতন বিষ্টুকে ক্ষমা না করে-তাহ'লে কিছুতেই সে সুখী হ'তে পারবে না। রতনের চেয়ে বড়ো বন্ধু আজ আর তার কেউ নেই।

এতটা প'ড়ে মনে মনে হাসলো রতন। বিষ্টুর তাকে অতো ভয় কেন? কি ধার ধারে সে রতনের? আর এতো ক'রে এসব কথা তাকে লেখবারই বা কি দরকার। মানুষ অন্যায় করলে বোধহয় মনে করে অন্য লোক সব সময় শুধু তার দোষটাই বড়ো ক'রে দেখে। আর একবার হেসে রতন আবার চিঠি পড়তে আরম্ভ করলো।

কিন্তু আসল কথা লিখেছে বিষ্টু শেষের দিকে। লিখেছে, ক্ল্যারাকে বিয়ে ক'রে অবশ্য একটা মস্ত লাভ হয়েছে তার, যেটা দুর্গা বেঁচে থাকলে কিছুতেই হ'তো না। মেমসাহেব বিয়ে করেছে ব'লে টমাস্ কুক্ কোম্পানীর এক সাহেব তাকে বোম্বাইএ একটা চাকরী দেবে বলেছে। মাল-পত্র চালান করা আর জাহাজ থেকে মাল খালাস করার কাজ তার। বোম্বাইএ থাকতে হবে তাকে। মাইনে যা দেবে বলেছে সাহেব তা'তে দু'জনের থাকা-খাওয়ার খরচ মোটামুটি একরকম ক'রে চ'লে যাবে। তা ছাড়া উপরি আয়ও আছে সে-চাকরীতে। কাজেই ক্ল্যারাকে সে এপ্রিল-মে মাসে দেশে নিয়ে যাবে। জাহাজে জাহাজে ঘুরতে আর ভালো লাগে না তার। তবু ভগবানের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। জাহাজের চাকরীটা নিয়েছিলো ব'লেই তো বোম্বাইএ এই চাকরী পাওয়ার সৌভাগ্য হ'লো তার। জাহাজেই টমাস্ কুক্ কোম্পানীর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিষ্টুর। ইচ্ছে করলে চাকরীটা এখুনি পেতে পারতো সে, কিন্তু নিজেই নেয়নি। কারণ জাহাজ-কোম্পানীর খরচেই সে আর একবার বিলেত আসা-যাওয়া করতে চায়। তাহ'লে ভাড়া লাগবে শুধু ক্ল্যারার, বিষ্টুর খরচ লাগবে না এক পয়সাও। এসব কথা লিখে আরও লিখেছে বিষ্টু, ক্ল্যারাকে লণ্ডনে তাদের বাড়ীতে রাখার জন্যে সে যে কতখানি কৃতজ্ঞ রতনের কাছে তা' বলতে পারে না। ক্ল্যারাকে সে আলাদা কোনো চিঠি লিখলো না, কারণ কোনো রকমে এক লাইনও ইংরেজী বেরোয় না তার কলম দিয়ে। সামনে থাকলে মুখে তবু কাজ চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু লিখতে গেলে কিছু বানানই করতে পারে না সে। একথা যেন রতন ভালো

ভাবে ক্ল্যারাকে বুঝিয়ে বলে, তার শরীরের কুশল জানায় আর গ্রীষ্ম কালে তার সঙ্গে চ'লে আসবার জন্যে তৈরী থাকতে বলে। তারপর দীনবন্ধু চৌধুরী আর সকলের খবর নিয়ে, সে খুব ভালো আছে জানিয়ে, রতন কেমন আছে, শীগগির বিয়ে করছে কিনা, লণ্ডনে এখন শীত কি রকম — এই সব জানতে চেয়ে, বিষ্টু তার পাতা সাতেকের লম্বা চিঠি শেষ করেছে।

চিঠি শেষ ক'রে রতন ভাবলো, বড়ো বোকা বিষ্টু, তার ঠিকানা দেয়নি। ইচ্ছে থাকলেও উত্তর দিতে পারবে না রতন। চিঠিতে পোস্ট আপিসের ছাপ দেখলো সে সিলোনের। আরে তাই তো, রতন নিজেও তো বোকা কম নয়। জাহাজে জাহাজে ঘোরে বিষ্টু, ঠিকানা দেবে কেমন ক'রে? মাথাটা বোধহয় একটু খারাপ হয়েছে রতনের।

চিঠি প'ড়ে মনটা হঠাৎ দ'মে গেল তার। বিষ্টুর এসে পড়বার আর তো খুব বেশী দেরী নেই। মাস কয়েক মোটে। তারপর বউকে নিয়ে সে চ'লে যাবে। বাড়ী আবার হ'য়ে যাবে খালি। আবার যে কে সেই। তিনদিন দাড়ি না কামিয়ে ঢেকুর তুলে ঘুরে বেড়াবে চৌধুরী। আবার সেই নোংরা কিচেন্, নোংরা বাথরুম। রাশি রাশি জঞ্জাল জ'মে উঠবে চারপাশে — আবার সারা বাড়ীতে দুর্গন্ধ। ভাবলেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে এখন রতনের। ক্ল্যারা যেন এ বাড়ীর লক্ষ্মী। তাকে বাদ দিয়ে এ বাড়ীতে বাস করবার কথা আর ভাবতে পারে না রতন। তার বুক খালি হ'য়ে যায়, হু হু ক'রে ওঠে প্রাণ। সেই ক্ল্যারা এই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে একদিন।

ক্ল্যারা, তার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলো রতন।

কি?

বিষ্টু চিঠি লিখেছে।

কই না তো!

আমাকে লিখেছে — তোমার কথা লিখেছে অনেক।

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো ক্ল্যারার মুখ। লিখেছে? কি লিখেছে? আমাকে এতোদিন একটাও চিঠি লেখেনি কেন?

তখন রতন কষ্টে-স্বষ্টে বিষ্টুর চিঠির সারাংশ বুঝিয়ে দিলো, আর তাকে কেন লেখে।ন সেকথাও বললো ভালো ক'রে।

ওমা, কী মজা, এতো শীগগির ইণ্ডিয়ায় যাবো আমি?

হ্যাঁ।

বল বল আর কি লিখেছে?

বললাম তো সব।

বড়ো ছোট চিঠি লেখে বিষ্টু, ক্ল্যারার উৎসাহ একটু ক'মে গেল যেন।

ক্ল্যারা!

কি?

তার একটা হাত ধ'রে বললো রতন, বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

কোথায়?

যেখানে যেতে চাও।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো ক্ল্যারা। তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বললো, না।

কেন ক্ল্যারা, তুমি রাগ করেছ আমার ওপর?

জানি না।

বল কি দোষ আমার?

কিছু বলবো না আমি।

ছিঃ ক্ল্যারা, ঝগড়া ক'রো না আমার সঙ্গে।

ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়।

তবে এমন ক'রে আমার সঙ্গে কথা বলছো কেন? আবার ক্ল্যারার হাত ধরলো রতন।

না, একটু দূরে স'রে গিয়ে ক্ল্যারা বললো, আমার সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা করতে এসো না রটন, তোমাকে আমার ভালো লাগে না।

আমি জানি, হেসে রতন বললো, একথা অনেকবার শুনেছি। কারুরই আমাকে ভালো লাগে না। রতন থামলো। সিগ্রেট ধরিয়ে একটু পরে বললো, তোমাকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ক্ল্যারা —

তাই বুঝি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাও?

হ্যাঁ।

আমি খুব দুঃখিত, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় হবে না।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। রতন নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে লাগলো। বিষ্টুর খোলা চিঠির ওপর চোখ রেখে একটু পরে থেমে থেমে বললো, তুমি — তুমি যে চ'লে যাবে ক্ল্যারা! এই বাড়ি, এই অল্ডগেট, এই দেশ ছেড়ে অনেক দূরে তুমি চ'লে যাবে, হয় তো আর কোনদিনও দেখা হবে না তোমার সঙ্গে, তাই —

তাই আমি চ'লে গেলে তোমাদের অসুবিধার কথা মনে ক'রে মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে বুঝি?

এ তুমি কি বলছো ক্ল্যারা?

তাহ'লে উপায়?

তুমি কি মনে করো আমি এতো স্বার্থপর?

তাই তো মনে হয়। এ বাড়ীতে আসবার পর থেকে নিজের সুখ-দুঃখ সমস্ত ভুলে গেছি আমি। শুধু তোমাদের প্রত্যেককে সুখী করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। সকলেই স্নেহ করেছে, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আমায়। শুধু তুমি —

আমি কি করেছি ক্ল্যারা?

হাসিমুখে কখনও কথা বলনি আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি, অথচ এমন ব্যবহার তুমি করেছো যেন আমি ডাইনী — তোমার বন্ধুকে যাদু ক'রে তার বউকে পুড়িয়ে মেরেছি —

না না একথা ভুল — রতন কি বলবে ঠিক করতে পারলো না।

না রতন, চাপা হাসি হেসে ক্ল্যারা বললো, ভেবো না দয়া ভিক্ষে করছি তোমার। ভেবেছিলাম কোনদিনও কোন নালিশ জানাবো না তোমাদের কারুর কাছে। আমি ডাইনী বিদেশিনী হ'লেও মানুষ। তাই শুধু দেখতে চেয়েছিলাম কত নিষ্ঠুর হ'তে পারো তুমি —

ছলছল ক'রে উঠলো রতনের চোখ। অনুতাপের গ্লানিতে ভ'রে উঠলো তার মন। সত্যি মায়া-দয়া ব'লে তার কিছু নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে নিয়ে ক্ল্যারার মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে সে শুধু বললো, ফরগিভ্ মি ক্ল্যারা!

আরও অনেক কথা বলতে চেয়েছিলো রতন, কিন্তু ভাষা হ'লো প্রতিবন্ধক। ইংরেজীটা কেন ভালো করে শিখলো না সে ভগবান! মাথা নিচু ক'রে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনে গেল রতন। ক্ল্যারার ঘরের পাশেই কিচেন। সেখানে ব'সে দীনবন্ধু রুটিতে পুরু মাখন মাখিয়ে কামড় দিচ্ছে।

রতনকে দেখতে পেয়েই হেসে বললো, কি রে, মান-অভিমানের পালা চুকলো? বলি হ্যাঁ রে রতনা, তুইও উড়ছিস? তা ওড়্ — ওড়্, তবে দেখিস শেষ অবধি টাল সামলাস বাপু। না হ'লে ওই বিটলেটার মতো কানের কাছে দিন-রাত্তির গোঙাস যদি, তাহ'লে আমাকেও একটা কিছু ক'রে হাপুস নয়নে তোদের সঙ্গে তাল রাখতে হবে। ব্যাস্ শালা তা হ'লেই একেবারে ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর — এই অল্ডগেটে বসেই শালার অক্ষয় স্বর্গ বাস!

সে-ঘর থেকেও তখুনি বেরিয়ে গেল রতন।

যতো ভাবে পরের ভাবনা একেবারে ভাববে না, তবু মাঝে মাঝে পরের ভাবনায় ঘুম হয় না রতনের। আজকাল থেকে থেকে তার দীনবন্ধুর কথা মনে হয়। নিজের মেয়ে আর পরিবার ছেড়ে আর কতোদিন সে থাকবে এখানে? একটু কি ক্লান্তিও আসে না ওর। যদি রতনের টাকা থাকতো

তাহ'লে এই মুহূর্তে সে ফিরে যেতো দেশে, নিজের দেশে সোনার সংসার পাততো, তার সোনা বউকে খুঁজে নিয়ে জগৎ ভুলে যেতো। দীনবন্ধুর হয়তো টাকা আছে, কতো তা সে ঠিক জানে না। তবু কেন দেশে ফিরে যায় না দীনবন্ধু, কি মোহে সে পড়ে আছে এ দেশে? বয়স তো কম হয়নি তার। দেশের জন্য কি একটু কাঁদে না ওর প্রাণ? আজ বহুদিন থেকে সে বলছে ব্যবসা না ক'রে অনেক টাকা না নিয়ে দেশে ফিরবে না। এদেশে এতোদিন থেকে দেশের সেই ছোটো বাড়ীর ছোটো ঘরে এখন তার পক্ষে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। তাই অনেক টাকা করতে চায় দীনবন্ধু। রতন ভাবে, শুধু পরের কাছে ধার ক'রে কেমন ক'রে টাকা করবে দীনবন্ধু। মূলধন তো কিছু চাই ব্যবসার। সে-টাকা কোথায় পাবে সে। দীনবন্ধু কিন্তু ওসব কথা ভাবে ব'লে মনে হয় না। তবু সে বলে, ব্যবসা করবো, অনেক টাকা যতোদিন না হয় ততোদিন দেশে ফিরবো না। কতো রকম লোক যে আছে পৃথিবীতে। দীনবন্ধুর কথা ভেবে রতন হাসে মনে মনে।

একদিন এমনি ভাবনা ভাবছে যখন রতন, ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকে বললো দীনবন্ধু, এই রতনা, বড়ো দরকার, চট ক'রে দে তো পাঁচটা পাউণ্ড এখুনি —

টাকা এখন নেই আমার।

কি বললি? দরকারের সময় দিবি না আমাকে তুই?

কি দরকার তোমার? শুধু মদ খেয়ে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি করবার জন্যে আর এক পেনিও তোমাকে আমি দেবো না কোনোদিন —

শালা আমার বাপ রে। বড়ো মুখ হয়েছে যে তোর আজকাল। বলি এতো কথা শেখালে কে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে দীনবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে রতন বললো, এবার বাড়ী ফিরে যাও দীনদা, বয়স হ'লো, কোনদিন ম'রে যাবে এখানে।

দেশে ফিরতে বললেই চটে যায় দীনবন্ধু। আজও রতনের কথায় ক্ষেপে উঠে বললো, শালা সৎপরামর্শ দিচ্ছে। বলি দেশে গিয়ে করবো টা কি শুনি? এই বয়সে দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করবো রে? এখানে তবু খাওয়া-পরার ভাবনা নেই!

এখানকার মতো চাকরের কাজ সেখানেও পাবে তুমি।

তা'তে আমার লাভটা হবে কি রে শালা? বিলেত থেকে ফিরে ইণ্ডিয়ায় শালার চাকর হবো আমি রে?

তাহ'লে পরিবারকে আনিয়ে নাও এখানে।

দিবি? দিবি শালা টাকা?

টাকা তো আছে তোমার।

তোর মাথা আছে। আর শালা আমি যদি হঠাৎ ম'রে যাই এখানে পরিবারকে দেখবি তুই?

কিন্তু এখন তাদের দেখছে কে?

দীনবন্ধু কিছুক্ষণ উত্তর দিলো না। একটু পরে বেশ গম্ভীর হ'য়ে বললো, শোন রতনা, ব্যবসা আমি করবোই, তারপর অনেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরবো।

সে তো এসে অবধি শুনছি।

আরে থাম্, বলি ব্যবসা রাতারাতি হয় রে? সময় লাগে তা'তে। শালার অ্যামেরিকা যাবো আমি।

কবে?

নাও শালা। বলি মুখ থেকে কথা খসিয়েছি ব'লে কি এখুনি ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে হবে নাকি রে? থাম্ থাম্ সবুর কর দু'দিন। দেখ্ না শালার ইণ্ডিয়া হাউসের মাথায় ভর ক'রে অ্যামেরিকা পৌঁছলাম ব'লে। সেখানেই ব্যবসা সুরু করবো ঠিক করেছি।

কিসের ব্যবসা?

আরে ম'লো যা হারামজাদা। বলি অতো খবরের তোর দরকার কি রে? শালা রইলি এতোদিন বিদেশেতে, এখনও আদব-কায়দা শিখলি না একটুও, খালি পরের ব্যাপারে নাক গলাবার ফন্দী। একটু থেমে বার কয়েক কেশে বললো দীনবন্ধু, কিসের ব্যবসা সেটা ঠিক করি নি এখনও। অ্যামেরিকা গিয়ে বাজার বুঝে তারপর তো ব্যবসা — শুনলি রে? আর বুঝলি রতনা, বড়ো সুন্দর সব মেয়েমানুষ সেখানে, তোদের লণ্ডনের মতো কাঠের পুতলী নয় রে শালা —

বুড়ো বয়সে এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

থাম থাম, মারবো এক থাবড়া। মানুষ ক'রে দিলাম বেটাকে, এখন আমাকেই দিচ্ছিস বক্তৃতা। শালার কথায় বলে না কারুর ভালো করতে নেই।... আচ্ছা অনেক হয়েছে, নে নে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো বের কর তো পাঁচটা পাউণ্ড —

রতন কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা চিঠি হাতে ক'রে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো খোকাবাবু। তার পাশের খবর এসেছে আজ। খুব ভালো ক'রে পাশ করেছে বঙ্কিম।

বাঃ বাঃ! ওরে রতনা শাঁখ বাজা, — খোকাবাবুকে কাঁধে তুলে নিলো দীনবন্ধু।

কিন্তু কিছুতেই তার বাবাকে চিঠি লিখতে চায় না খোকাবাবু। বলে, আমার মা নেই। আর বাবার কি কাণ্ড দেখুন, কার উড়ো চিঠিতে বিশ্বাস ক'রে কী বিপদেই ফেলে দিলেন আমাকে! আপনাদের সঙ্গে দেখা না হ'লে কি করতাম আমি বলুন তো। তাই বাবাকেও জব্দ করতে চাই আমি এবার, ম'রে গেলেও কোনো খবর দেবো না। একটা চাকরী খুঁজে নেবো এখানে, তারপর নিজের পয়সায় দেশে ফিরে হোটেলে উঠবো, দেখাও করবো না বাবার সঙ্গে কোনোদিন।

খোকাবাবু সারাদিন বলে এমনি আরও অনেক কথা।

ছি ছি ছি খোকাবাবু, দীনবন্ধু বোঝায় তাকে, বিলেতে লেখাপড়া শিখে এতো অবুঝ হ'তে হয় কখনও ? কতো আশা তোমার ওপর তোমার বাবার, কতো সাধ ক'রে তিনি তোমাকে এদেশে পাঠিয়েছেন মানুষ হবার জন্যে। তোমাকে রাঙা টুকটুকে বউ খুঁজে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিশ্রাম করবার বয়স এখন তাঁর। তাই তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে কতো দুঃখ পাবেন তিনি বলো তো ? এই বয়সে তাঁকে এমন ক'রে দুঃখ দেয়া তোমার কি উচিত খোকাবাবু ? আর একদিনও এদেশে থেকে সময় নষ্ট ক'রো না খোকাবাবু। তুমি ফিরে যাও।

কিন্তু তিনি কি আমার কথা ভেবেছিলেন ?

বাপ ছেলের কথা ভাবে না এ কি সম্ভব খোকাবাবু ? শত্রুর অভাব তো নেই দেশে, কারুর ভালো কেউ দেখতে পারে না সংসারে। তাই কে না কে তাঁকে যা তা লিখে দিয়েছে তোমার নামে। এদেশের কথা কি ভাবে আমাদের দেশের বুড়ো মানুষরা তা'তো জানোই। কিন্তু তুমি তো ভালো ক'রে পাশ করলে খোকাবাবু — এবার সকলের ভুল ভেঙে দেয়াই তোমার কাজ। যাও দেশে ফিরে বড়ো কাজ ক'রে তুমি দেখিয়ে দাও যে এদেশে এলেই লোকে খারাপ হয় না, তোমার মতো সোনার চাঁদ ছেলে মানুষ হ'য়েও দেশে ফিরে যায়। তুমি ফিরে যাও খোকাবাবু, দশের মুখ রাখো, দেশের নাম রাখো, আর আজই সব কথা তোমার বাবাকে গুছিয়ে সব লিখে দেশে ফেরার ভাড়া চেয়ে পাঠাও। এবার আর তিনি তোমায় অবিশ্বাস করবেন না খোকাবাবু। বঙ্কিমের হাত ধ'রে এতো কথা বলতে বলতে গলা ধ'রে এলো দীনবন্ধুর।

দিন পনেরো পরে বঙ্কিমের বাবার কাছ থেকে এলো তিন হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট্। ছেলেকে না দেখে আর একদিনও থাকতে পারছেন না তিনি — কোনদিন ম'রে যাবেন ঠিক কি ! কাজেই টাকা পেয়েই যেন অবিলম্বে বঙ্কিম প্লেনে ফিরে আসে। জাহাজে অনেকদিন সময় লাগে, অতোদিন কিছুতেই

ধৈর্য ধরতে পারবেন না তিনি। বঙ্কিমের জন্যে তিনি খুব ভালো চাকরী ঠিক ক'রে রেখেছেন, আর এর মধ্যেই দেখে রেখেছেন সুন্দরী বউ। ব্যারিস্টার রায় সাহেবের মেয়ে, চমৎকার পিয়ানো বাজায়। তাই বঙ্কিম যেন চিঠি পেয়েই উড়ে আসে তার বাবার কাছে। আর, যে তাঁর কাছে ছেলের নামে মিথ্যা কথা লিখেছিলো তাকে সহজে ছাড়বেন না তিনি।

আপনি ঠিক বলেছিলেন দীনদা। বাবা টাকা পাঠিয়েছেন, প্লেনে ফিরতে হবে আমাকে।

দেখলে খোকাবাবু, দেখলে বাপের প্রাণ!

চেকটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে বঙ্কিম বললো, আপনারা আমার যে উপকার ক'রেছেন সে-ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। তবু আজ যখন টাকা এসেছে, তখন আমার এতো দিনের থাকা-খাওয়ার খরচটা নিতেই হবে আপনাদের।

ছি ছি ছি ছি, এ কি একটা কথা হ'লো খোকাবাবু? আমাদের দেশের ছেলে তুমি, তোমাকে পাশ করিয়ে দিলাম আমরা— তা'তেই কি উঠে যায়নি আমাদের খরচ? আর এখানে এভাবে একসঙ্গে থাকলে কিছুই তো আলাদা খরচ তোমার জন্যে হয় না। বড়ো লোকের ছেলে তুমি, এভাবে তোমাকে রাখতে দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিলো খোকাবাবু।

ওকথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না দীনদা। আপনাদের কথা আমি জীবনে ভুলবো না।

দিন কয়েকের মধ্যে প্লেন পাওয়া গেল।

কাল বিকেলে হীথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়বে বঙ্কিমের প্লেন। রতন দীনবন্ধু আর চৌধুরীকে উপহার দিয়েছে সে সিল্কের দামী সার্ট আর টাই। ক্ল্যারাকে দিয়েছে লাল রঙের হ্যাণ্ড ব্যাগ।

সকলের মন থম্ থম্ করছে — আর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে বঙ্কিম ছেড়ে

যাবে তাদের। দেশের কথা মনে পড়ছে আজ সকলের। ওদের কাঁদিয়ে কাল চ'লে যাবে খোকাবাবু। পড়তে এসেছিলো — কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফিরে যাচ্ছে ঘরের ছেলে। আর ওরা। সেই সব কথা মনে পড়ছে প্রত্যেকের। এমনি ক'রে কবে তারাও ফিরে যেতে পারবে! কিন্তু যাবে কোথায়? খোকাবাবুর বাবার মতো সাজানো বিরাট বাড়ী নিয়ে কে ব'সে আছে ওদের জন্যে!

রাত্তিরে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছিল ক্ল্যারা। হয়তো কাল আর এখানে খাওয়ার সময় হবে না বঙ্কিমের। তাই ক্ল্যারা তার হাত ধ'রে বললো, এ বাড়ীতে আজ তোমার লাস্ট্ সাপার —

রতন বাড়ীতে নেই। আরও ঝিমিয়ে পড়েছে চৌধুরী। গভীর কুয়াশায় অন্ধ চারপাশ। বাস-ট্রাম বন্ধ হ'য়ে গেছে আজ সন্ধ্যে থেকে। রাস্তায় শুধু দিশাহারা পথিকের কলরব। খাওয়ার পর বঙ্কিমকে দীনবন্ধু নিয়ে এলো তার ঘরে।

ব'সো ব'সো খোকাবাবু, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে। কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বেরোয় না দীনবন্ধুর মুখ থেকে। বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে সে ব'সে থাকে। আজ খোকাবাবু ব'সে আছে এই ঘরে তার সামনে, কাল এতোক্ষণে সে কোথায় চ'লে যাবে — কত দূর — দীনবন্ধু ভাবে সেই কথা।

খোকাবাবু?

কি দীনদা?

তোমার খুব ভালো লাগছে, না খোকাবাবু?

আপনাদের ছেড়ে যেতে কষ্টও আমার খুব হচ্ছে দীনদা। এতো যত্ন এতো উপকার কেউ কি করে আজকাল কারুর জন্যে?

ছি ছি, ওকথা ব'লে আর আমাদের পাপ বাড়িও না খোকাবাবু। ওপরে তাকিয়ে দীনবন্ধু বললো, দু'দিন সবশুদ্ধ লাগবে তোমার, না?

বঙ্কিম মনে মনে হিসেব ক'রে বললো, যদি প্লেন ঠিক সময় ছাড়ে তাহ'লে দু'দিনেরও কিছু কম।

তারপর তুমি দেশে পৌঁছে যাবে খোকাবাবু। কতো বড়োলোক হবে তুমি, তখন কি আর আমাদের মনে রাখবে!

আপনাদের ভুলবো আমি!

আবার চুপচাপ। আর কোনো কথা খুঁজে পায় না দীনবন্ধু। ক্ল্যারা বাসন ধুতে ধুতে গান গাইছে, শুধু ভেসে আসছে তারই গানের কলি। আস্তে আস্তে উঠে দীনবন্ধু বঙ্কিমের একটা হাত চেপে ধরলো, খোকাবাবু আমার একটা উপকার করবে?

আশ্চর্য হ'য়ে বঙ্কিম বললো, একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন দীনদা? আপনাদের কোনো কাজ করতে পারলে আমি সত্যি খুশী হবো। বলুন কি করতে হবে আমাকে?

শেয়ালদা' স্টেশনের দিকে কখনও গেছো খোকাবাবু?

কতোবার!

বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন চেনো?

খুব চিনি।

ব্যাস, তাহ'লে ঠিক আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে খুব সাবধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে দীনবন্ধু খুললো তার বহুদিনের পুরানো স্টীল ট্রাঙ্ক। সেখান থেকে বের করলো একটা বড়ো বিলিতি ডল্ আর এক শিশি ওষুধ। তারপর আবার বঙ্কিমের পাশে ব'সে বললো, আমি যখন এখানে আসি সে-আজ তেরো-চোদ্দ বছর আগের কথা খোকাবাবু। আমার স্ত্রী হার্টের অসুখে ভুগছিলো তখন। এখানে ভালো ইংরেজ ডাক্তারের কাছে রোগের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে এই ওষুধ নিয়েছি আমি — আর আমার মেয়ের জন্যে কিনেছি এই পুতুল। তুমি যদি তাদের কাছে দয়া ক'রে এগুলো পৌঁছে দাও খোকাবাবু —

নিশ্চয়ই দেবো দীনদা, বাড়ীর নম্বরটা কতো বলুন।

তখন ছিলো সাত নম্বর বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন। কিন্তু আমি জানি না এখন তারা কোথায়, বেঁচে আছে না ম'রে গেছে। তবু কথা দাও খোকাবাবু, যদি বেঁচে থাকে তুমি গিয়ে তাদের খুঁজে বের করবে। ও পাড়ায় গিয়ে বললেই হবে, সেই জাহাজের চাকরী নিয়ে যে বিলেত গিয়েছিলো তার পরিবার, তাহ'লে পাড়ার কোন না কোন লোক নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের খবর ব'লে দেবে। বল খোকাবাবু আমার এ উপকার করবে তুমি?

অমন ক'রে বলবেন না দীনদা, কলকাতায় পৌঁছে যেমন ক'রে হোক আমি আপনার বাড়ী খুঁজে বের করবোই।

খুব জোরে বঙ্কিমের হাত চেপে ধ'রে বললো দীনবন্ধু, তোমার ভালো হবে, আমি বলছি তুমি মানুষ হবে, অনেক — অনেক বড়ো হবে তুমি খোকাবাবু —

উত্তেজনায় দীনবন্ধুর সমস্ত শরীর কাঁপছিলো।

পরদিন কুয়াশার জন্যে খোকাবাবুর প্লেন যথাসময় ছাড়লো না, উড়লো রাত্তির দশটায়। ক্ল্যারা রতন চৌধুরী দীনবন্ধু সকলেই গিয়েছিলো এয়ার পোর্টে।

ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলো চৌধুরী। এরা তাকে কিছুতেই সামলাতে পারছিলো না। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে গেল সকলের। বিছানায় গড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো চৌধুরী।

চুপ করো চৌধুরী, ছেলেমানুষী করে না। এই মন নিয়ে কেউ দেশের বাইরে বেরোয়!

খোকাবাবুকে পৌঁছতে যাবে ব'লে আইলীনের ওপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আজ ছুটি নিয়েছিলো রতন। কাল খুব সকালে গিয়ে পৌঁছতে হবে

তাকে। না হ'লে বড়ো মুস্কিলে পড়বে বেচারী আইলীন। কিন্তু চৌধুরীর অবস্থা দেখে তার ভয় হচ্ছিলো। সারা রাত এমন করলে ঠিক ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়বে সে, আর তাহ'লে কিছুতেই রতনকে তুলে দিতে পারবে না ভোর বেলা।

কাল আমাকে আরও সকালে তুলে দিও ভাই, রতন পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো রতনের। যা ভেবেছিলো তাই। চৌধুরী তাকে তুলে দিতে পারে নি ভোর বেলা।

বলে দিলাম অত ক'রে, কম্বল সরিয়ে বিরক্ত হ'য়ে খাটের ওপর উঠে বসলো রতন।

কিন্তু চৌধুরীর মুখ দেখে শিউরে উঠলো সে। তারপর লাফিয়ে খাট থেকে নেমে তার কপালে হাত দিলো। জমাট বরফের মতো ঠাণ্ডা দেহ চৌধুরীর। খোলা চোখ তার, স্থির সে-চোখের মনি। গালে কাল রাত্তিরের চোখের জলের শুকনো দাগ। আর তার দেহের চারপাশ ঘিরে উড়ছে কতকগুলো পোকা। অতো মাছি একসঙ্গে লণ্ডনে কখনো দেখেনি রতন। মশাও নয়। তবে ওগুলো কি পোকা?

রতন জানে না তার নাম।

১২

কিন্তু আবার নতুন ক'রে লণ্ডন ভালো লাগে রতনের। আবার এই পথ, এই ধূলিকণা, লণ্ডনের প্রতি মুখ তাকে ইসারায় বলে, তুমি আমাদের। আমাদের ছেড়ে, লণ্ডন ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি! কতো কি পেয়েছে রতন এখানে তুলনা নেই তার।

একদিন নিঃশব্দে নেমে এলো নতুন তুষার। রতনের চির-চেনা সেই সহস্র ভিজে শেফালী। রিমঝিম রিমঝিম বাজে একটানা মন্থর সুর। সোনা বউ এলো আজ — রতন তার চুলের গন্ধ পায়। পায়ে তার মল। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কানে কানে কতো কথা বলে সে। আজও লজ্জা ভাঙেনি তার। এই তুষার এমন ক'রে একদিন সে দেখতে পাবে না সেকথা ভাবতে ভয় হয় রতনের। এতো নির্জনে সোনা বউকে পৃথিবীর আর কোথায় পাবে সে!

নিমেষে নিমেষে রঙ বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর। এতো শুভ্র রেশম এতো-দিন কোথায় লুকিয়েছিলো! কতো নেবে সোনা বউ, আঁচল ভ'রে তুলে নাও আকাশ-ঝরা ভিজে শেফালী, লজ্জা ক'রো না, কেউ দেখছে না আমাদের।

তবু সোনা বউ কথা বলে না। গাছের পাতারা নেই। পাখীরা কোথায়! বাসা বেঁধেছে গাছে তুষারের দল। রতনকে দেখলেই তারা চঞ্চল হ'য়ে ঝ'রে পড়ে আর সে শোনে তাদের কলরব। ওরা যেন রতনের শুভ্র পাখীর দল। মুঠো ভ'রে সে তুলে নেয় তাদের, আর কচি বুকের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়।

আস্তে আস্তে নরম তুষার হাতের মুঠোয় অনুভব করে রতন। এদের ছেড়ে বাঁচবে কেমন ক'রে সে — এদের ছেড়ে যাবে কোথায়!

ভূপাল জাহাজ থেকে চিঠি লিখেছে রটন।

আইলীনের কথায় ধ্যান ভাঙলো রতনের। দরজার কাছ থেকে স'রে এসে বললো, তাই নাকি? কি লিখেছে?

কতো কি, সব কথা কি বলতে পারি তোমাকে!

গোপন বুঝি?

হ্যাঁ খুব গোপন, আইলীন কিন্তু চেপে রাখতে পারে না ভূপালের গোপন কথা। বুক ভরা উচ্ছ্বাসে একে একে সব খুলে বলে রতনকে। আমি ওর কাছে নেই ব'লে জাহাজে এতো লম্বা পথ ওর একটুও ভালো লাগছে না, বার বার ঝাঁপ দেবার ইচ্ছে হচ্ছে —

হুঁ, তা' সত্যি ঝাঁপ-টাপ দেবে না তো?

ঠাট্টা না বুঝতে পেরে আইলীন বললো, দূর তা' কি দেয়? আর লিখেছে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে।

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ইণ্ডিয়া যাবার কি দরকার ছিলো? প্যারিস ঘুরে এলেই তো পারতো।

বাঃ, আমার বুঝি ভূপালের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না?

করে নাকি? কিন্তু তোমাকে নিয়ে তো ভূপাল দেশে যাবে না, এখানেই তো থাকবে শুনি বরাবর?

মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবো বৈ কি আমরা। ভূপালের দেশ দেখবো না তা'কি হ'তে পারে!

গরমে খুব কষ্ট হবে যে তোমার ভারতবর্ষে।

শীতের সময় যাবো আমরা। আর যখনই যাই, ভূপালের কষ্ট না হ'লে আমারও কোন কষ্ট হবে না।

এত ভালোবাসো তুমি ভূপালকে?

আইলীন হেসে বলে, ও আমাকে খুব ভালোবাসে। এই বেচারা কতোবার লিখেছে সেকথা। আমার মতো ভালো কাউকে কখনও বাসেনি ভূপাল। এখন দূরে গিয়ে সেকথা আরও ভালো ভাবে বুঝতে পারছে। আর, একটু থেমে বলে আইলীন, জানো রতন, আমিও বুঝতে পারছি —

তোমরা সুখী হও, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে রতন আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কাচে লক্ষ তুষার-কণার ভীড়। রাস্তা দেখা যায় না। পুরু কাচ ভেদ ক'রেও ঘরে ঠাণ্ডা ভাব ভেসে আসছে। আইলীন এসে রতনের পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু রতন বোধহয় বুঝতেই পারলো না কখন সে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

তোমাকে ভূপাল চিঠি লেখেনি রটন?

না, হেসে বললো রতন, আমাকে তো আর তোমার মতো ভালোবাসে না।

দেশে পৌঁছে তোমাকে লিখবে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, হিসেব-পত্র চাইবে তো।

সেই তুষার মাথায় ক'রেও এই প্রথম খদ্দের এলো ইণ্ডিয়া গ্রীনে। আইলীন কি বলতে যাচ্ছিলো রতনকে, কিন্তু খদ্দের দেখে তার কোট ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রতন বললো, গুডমর্ণিং স্যার।

গুডমর্ণিং, আইলীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রলোক বললো, নাস্টি ডে —

মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে আইলীন বললো, ইস্ ইন্‌ট্ ইট্।

রতনের চোখের সামনে কিন্তু তখনও তার সোনা বউ।

মাঝে মাঝে অনেক কথা মনে হয় রতনের। কোথায় যাবে সে এদেশ ছেড়ে? একবার গেলে আর তো ফেরা যাবে না। কেমন ক'রে থাকবে সে তার ছোটো গ্রামে? আর কি ক'রে চালাবে খরচ? এরকম রেস্তোরাঁ

তো নেই তার গ্রামে। শহরের কোনো হোটেলে চাকরী নিলে খরচ চলবে না তার। বেশী মাইনে কে দেবে তাকে? কি কাজ পাবে সে? ইংরেজী তো জানে না রতন। তাঁর চেয়ে অনেক টাকা ক'রে নিয়ে দেশে গিয়ে যদি একটা ভালো হোটেল খোলা যায়! কিন্তু দেশের লোক এদেশের লোকের মতো এতো বেশী বাইরে খায় না। চলবে কেমন ক'রে তার হোটেল? কিছুই করবার নেই রতনের। শুধু একবার ভূপালের মতো মাস কয়েকের জন্যে দেশে যাবে সে। সোনা বউকে খুঁজে বের করা চাই। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার চ'লে আসবে লণ্ডনে। অল্ডগেটে একটা ছোটো ফ্ল্যাটে থাকবে তারা। প্রাণভরে দেখবে কতো তুষারের দিন। নতুন চাকরীর ভাবনায় ভুগতে হবে না তাকে। ইণ্ডিয়া গ্রীলে তার আয় যা তাতে দু'জনের ভালোভাবে চ'লে যাবে লণ্ডনে। এই তো তার দেশ। কোথায় যাবে রতন এদেশ ছেড়ে! যাদের ছেড়ে এসেছে তাদের সঙ্গে আর তো মিলে মিশে থাকতে পারবে না রতন।

তবু থেকে থেকে মন কাঁদে। পুজোর ঢাক কানে বাজে, জমিদারবাবুর বাড়ীতে যাত্রার রাত্তিরের সেই কোলাহল মনে পড়ে। আর মনে হয় তাদের কুঁড়ে ঘরের কথা। তার মামা মামী কি আজও বেঁচে আছে। অনেক চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পায়নি রতন। ম্লেচ্ছর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবার এতোটুকুও ইচ্ছে নেই তাদের। বোধ হয় রতনের চিঠি তারা না ছুঁয়ে কাউকে দিয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলেছে, প'ড়েও দেখেনি একবার। এখানে এসে মামার নামে টাকাও পাঠিয়েছে রতন অনেকবার, সে-টাকা কিন্তু ফিরে আসেনি আবার। হয়তো গঙ্গাজলে শোধন ক'রে নিয়ে সে-টাকা খরচ করেছে মামা। লক্ষীকে ফিরিয়ে দিতে সাহস হয়নি তার। কাজেই আজ কার কাছে ফিরে যাবে রতন! তাকে চিনতে পারবে কে?

তাই আবার নতুন ক'রে লণ্ডন ভালো লাগে রতনের!

ক্লারার হাত ধরে রতন বললো, এখনও রাগ যায়নি তোমার ?

অমন ক'রে আমার হাত ধ'রো না রটন্।

চলো ক্লারা একদিন আমার দোকানে যাবে, সারাদিন ব'সে থাকবে সেখানে, কতো গল্প করবো আমরা দু'জন।

দুঃখিত, আমার সময় নেই তোমার সঙ্গে গল্প করবার।

সারাদিন একা একা থাকতে খারাপ লাগে না তোমার ?

ঘরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে।

তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ক্লারা।

ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে নয়।

তা হ'লে ইণ্ডিয়ান বিয়ে করলে কেন ?

ভুল করেছি। আর তো উপায় নেই।

উপায় আছে, বিষ্টুকে ছেড়ে আবার তো চ'লে যেতে পারো তুমি। তোমাদের দেশে তো অমন কতো হয়।

দরকার হ'লে যাবো বৈকি, রতনের দিকে তাকিয়ে ক্লারা বললো, পুড়ে মরবো না নিশ্চয়ই।

পুড়ে মরতে হ'লে সাহস চাই, তোমাদের সে মনের জোর নেই।

দাঁত চেপে ক্লারা শুধু বললো, মনের জোর ! আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা ঠিক নাও হ'তে পারে রটন্। আর একটা কথা জেনে রাখো, তুমি আমাকে যতখানি ঘৃণা করো, তার চেয়েও বেশী ঘৃণা করি আমি তোমাকে।

ইংরেজ হ'য়ে মনের-কথা এতো স্পষ্ট ক'রে ব'লো না ক্লারা।

ইংরেজ হ'লেও আমি ইণ্ডিয়ানের বউ।

রতন হেসে বললো, স্বামীকে চেনো নাকি তুমি ?

তোমার সঙ্গে এতো কথা আমি বলতে চাই না রতন।

আবার হাসলো রতন, কতবার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছি ক্লারা।

ক্ল্যারাও হেসে বললো, তোমার ওপর আমার এতোটুকুও রাগ নেই রটন্।

তাহ'লে চলো, একদিন যাই আমরা দু'জন ?

নিশ্চয়ই যাবো। একটু অপেক্ষা কর, আর কিছুদিন যাক, আমার স্বামী আসুক, তারপর আমরা তিনজনে মিলে অনেকবার বেড়াতে যাবো।

তাইতো, বিষ্টুর আসবার তো আর খুব বেশী দেরী নেই। বউ নিয়ে দেশে ফিরে যাবে সে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো রতন।

দীনবন্ধু ভয় পেয়েছিলো। এতো ভয় বোধ হয় জীবনে আর কোনোদিনও সে পায়নি।

বেথ্নেল গ্রীন ক্রিমেটোরিয়ামে ইলেকট্রিকে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল ব্রাহ্মণ চৌধুরীর দেহ। মৃতদেহ চারদিন পড়েছিলো অল্ডগেটে। ওরা ভেবে পায়নি কি করবে সেটা নিয়ে। আলি সাহেব টেলিফোন ক'রে চারদিনের দিন মৃতদেহের গতি করে দেয়।

এমনি ক'রেই হঠাৎ যদি শেষ হ'য়ে যায় দীনবন্ধু! আর ক'দিনই বা তার আয়ু?

রতন? ওরে রতন রে?

কি দীনদা, হ'লো কি তোমার?

এবার আমার পালা রে!

পালা? কিসের?

যাবার পালা রে! শালার অল্ডগেট ছেড়ে যেতে হবে।

শঙ্কিত হ'য়ে রতন বললো, কোথায়? অ্যামেরিকা যাওয়া ঠিক ক'রে ফেললে নাকি?

অ্যামেরিকা নয় রে, ওপরে আঙুল দেখিয়ে দীনবন্ধু বললো, ওপরের দিকে 'শালা, চৌধুরী যেখানে গেছে সেখানে।

আরে দূর, কি যে বলো! নিশ্বাস ছেড়ে রতন বললো, বেচারা চৌধুরী বড়ো ভালো লোক ছিলো। কত্তো দুঃখ দিয়েছি আমরা তাকে। দেশে ফিরে যাবার বড়ো ইচ্ছে ছিলো বেচারার।

দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেই কি ফেরা যায় রে!

চলো বিষ্টুর সঙ্গে আমরাও ফিরে যাই দীনদা?

যাবি কোথায় রে রত্না? কি নিয়ে যাবি বল?

রতনের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আবার দীনবন্ধু বললো, টাকা করবার জন্যে এসেছিলাম শালার, র'য়েও গেলাম টাকা করবার জন্যে, কিন্তু কি করলাম শালার?

ওদের চোখের সামনে সব ঝাপসা হ'য়ে যায়।

ভূপাল দেশে পৌঁছবার কিছুদিন পর রতনকে সে বাড়ীর ঠিকানায় একটা লম্বা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখলো। চিঠিটা বারবার পড়লো রতন, কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে পারলো না নিজের চোখকে। ভূপাল আর ফিরবে না। হোটেল বিক্রী ক'রে দিতে চায় সে। রতন প্রথম থেকে আর একবার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলো —

প্রিয় রতন,

ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। জাহাজে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে আরব সাগরে জাহাজ বড়ো দুলিতেছিলো, তাই দিন দু'একের জন্য সামান্য একটু পেটের অসুখ হইয়াছিল। কলেরা হইতে পারে মনে করিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম পরিবারের সঙ্গে আর দেখা হইল না।

কিন্তু দেশে পৌঁছিয়া বড়ো ভালো লাগিতেছে। এই বয়সে পুত্র-কন্যা-পরিবার ছাড়িয়া আর বিলাত যাইতে পারিব না — উৎসাহ নাই। টাকা রোজগার করিতে গিয়াছিলাম, অনেক রোজগার করিয়াছি। আর অর্থের

প্রয়োজন নাই আমার। কলিকাতায় একটি অমনি হোটেল খুলিব ভাবিতেছি।

মাসে মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাইলেও আমার অনুপস্থিতিতে সংসারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বাড়ী আগাগোড়া নূতন করিয়া সারাইতে হইবে। আত্মীয়-স্বজনেরা আমার পরিবারের নিকট হইতে অনেক টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে। তাই এই বয়সে অসহায় তাহাকে ছাড়িয়া অতো দূর দেশে যাওয়া আমি উচিত মনে করি না। আর পরিবার বড়ো ধরিয়াছে তাহাকে লইয়া কিছুদিন কাশীবাস করিতে হইবে। কাজেই পুনরায় বিলাত পাড়ি না দিয়া আপাতত কাশী যাওয়া স্থির করিয়াছি। তাই তোমার উপর সমস্ত ভার চাপাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

তোমার হয়তো লণ্ডনে ব্যবসা করিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহা হইলে তুমি ইণ্ডিয়া গ্রীল কিনিয়া লইতে পারো। আমাকে মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা দিলেই চলিবে। আর যদি তুমি নিজে কিনিতে না পারো, তাহা হইলে সেই ইটালিয়ান পিটার সাহেবের সহিত দেখা করিবে। দোকানটি কিনিবার জন্য বহুবার সে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করিয়াছিল। তাহাই ভালো মনে হয়। কেন না তুমি কিস্তিতে টাকা দিয়া কিনিলে আমার অসুবিধা হইবে। থোকে একসঙ্গে সমস্ত টাকা পাইলেই ভালো হয়। বয়স হইয়াছে, কোনদিন মরিয়া যাইবো ঠিক কি!

তুমি পত্রপাঠ পিটার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া ফেলিবে। সে আমাকে দু'হাজার পাউণ্ড দাম দিতে চাহিয়াছিলো। বেশী দরাদরি করিবে না, ওই দামেই রাজী হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি গরজ বুঝিয়া কিছু বাড়াইতে পারো তাহা হইলে আমি খুবই খুশী হইবো।

তোমাকে আমি বড়ো বিশ্বাস করি। আশা করি সে-বিশ্বাস ভাঙিবে না। আরও একটি কথা, মার্চ মাসে আমার বোন-পো বিলাত যাইতেছে। আমি তাহাকে লেখাপড়ার জন্য পাঠাইতেছি। রিজেন্ট পলিটেকনিকে সে

বছর খানেক ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় পড়িবে। আমি আসিবার সময় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম। সে তোমার কাছ হইতে হিসাব-পত্র ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবে। তাহার নাম সুবোধ দত্ত। সে পৌছিবার আগেই তুমি পিটারের সঙ্গে কথা পাকা করিয়া রাখো, যেন সে যাওয়ার দু'একদিনের মধ্যেই দোকান বিক্রয় হইয়া যায়।

আর বেশী কি লিখিবো। আশা করি কুশলে আছো। প্রতি সপ্তাহের হিসাব আমাকে এয়ার মেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবে। যেন কিছুতেই কোনো সপ্তাহ বাদ না পড়ে। ইতি —

ভূপালচন্দ্র মল্লিক

তাহ'লে ভূপাল আর ফিরবে না। রতন ভাবলো সে বোধহয় আগে থেকেই ঠিক ক'রেছিলো সে আর ফিরবে না। কথাটা তাকে আগে বলেনি কেন? এখন কি করবে রতন? না, হোটেল কিনে নেবার ক্ষমতা নেই তার, আর অতো ঝামেলা মাথায় নেবার বিদ্যেও নেই। অন্য একটা চাকরী খুঁজে নিতে হবে তাকে। লণ্ডনে ওয়েটারের বড়ো অভাব, চাকরী পেতে বেশী দেরী হবে না তার।

কিন্তু আইলীনকে কি বলবে রতন — কেমন ক'রে আরম্ভ করবে কথা? সে বেচারী যে দিন গুনছে ভূপালের আসার পথ চেয়ে। কেমন ক'রে তার আশা ভেঙে দেবে রতন! আইলীনের নামও করেনি ভূপাল চিঠির কোনো জায়গায়।

ভূপাল আর আসবে না শুনে হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যাবে আইলীন। বেচারীর বড়ো সাধ ভূপালের সঙ্গে ঘর বাঁধবার। ভারতবর্ষে যাবার কতো সখ! কেমন ক'রে তার সোনার স্বপ্ন চুরমার ক'রে দেবে রতন?

পরদিন সেই চিঠি পকেটে নিয়ে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এলো সে। কাজ আরম্ভ করলো যথাসময়। খদ্দেরকে করলো যথারীতি পরিবেশন। অনেকবার

চেষ্টা করলো ভূপালের কথা আইলীনকে বলবার। আইলীনকে এ খবর দিতে বুক ভেঙে যাচ্ছিলো রতনের।

তবু ইতস্তত ক'রে একসময় আইলীনকে নির্জনে ডাকলো রতন।

ইয়েস রটন, কি বলছো ?

ভূপালের আর কোনো চিঠি পেয়েছো তুমি ?

না গো, খুশীতে গদগদ হ'য়ে আইলীন বললো, এই তো সেদিন জাহাজ থেকে অতো বড়ো চিঠি লিখলো। আমি যে উত্তরও দিইনি তার এখনও। আমাকে ও চিঠি লিখতে বারণ করেছে কিনা।

কেন বারণ করলো ?

ওর স্ত্রী চিঠি চুরী করতে পারে ব'লে। বড়ো নীচ মন কিনা তার !

কিন্তু ভূপাল তোমাকে আর চিঠি লেখে না কেন ?

আমাকে চিঠি লিখতে গেলে ওর মন বড়ো খারাপ হ'য়ে যাবে, আমার কথা মনে প'ড়ে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে পারবে না ও।

হঠাৎ সটান ব'লে ফেললো রতন, ভূপাল যদি আর না ফেরে আইলীন ?

বাজে কথা ব'লো না রটন, অতো হিংসে কেন তোমার ওকে ?

ভূপাল আর ফিরবে না আইলীন।

হুঁ ? তোমার মৎলবটা কি শুনি ? কি চাও তুমি আমার কাছে ?

হেসে রতন বললো, কিছু না। কিন্তু আমি বলছি আইলীন, ভূপাল আর ফিরবে না।

ভূপালের কথা আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো দেখছি।

হ্যাঁ, বোধহয় জানি। শোন আইলীন, একবার দেশে যেতে পারলে আর কি কেউ সহজে ফিরে আসে এদেশে ? আর ফেরা যায় না। দেশে ওর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সংসার —

আর এদেশে রয়েছি আমি, আমার চেয়ে বেশী ভালো ভূপাল আর কাউকে বাসে না রটন।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে রতন বললো, ভূপাল আমাকে চিঠি লিখেছে।

ও, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, লিখেছে —

কি লিখেছে ?

আস্তে আস্তে পকেট থেকে চিঠি বের ক'রে আইলীনকে দেখিয়ে রতন বললো, লিখেছে আর ফিরবে না, হোটেল বিক্রী ক'রে দিতে চায় ও।

ভূপালের হাতের লেখা দেখে মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে আইলীন বললো, ওমা, এ অক্ষর তো আমি চিনি না।

চিঠিটা ইংরেজী ক'রে প'ড়ে শোনাবো তোমাকে ?

যদি তুমি চাও —

হেসে রতন বললো, তোমার নামও করেনি কিন্তু।

তোমার চিঠিতে আমার নাম না ক'রলেও ক্ষতি নেই রটন্।

আবার হেসে তার অদ্ভুত ইংরেজীতে প্রত্যেকটি লাইন অনুবাদ ক'রে রতন বুঝিয়ে দিলো আইলীনকে। আইলীন কিন্তু বুঝতে পারলো সব কথা। ভূপালের মনের ভাব ভালো ক'রে জানে সে। তাই চিঠি শেষ হ'তেই খিল খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। রতনেব কাঁধে হাত দিয়ে বললো, তুমি বড়ো বোকা, ভূপালকে একেবারেই বুঝতে পারো না। দেখছো না তার ভায়েকে পাঠাচ্ছে। কেন অতো পয়সা খরচ ক'রে তাকে পাঠাচ্ছে সে ? বোকা ! আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। কলকাতায় দোকান খোলবার কথা লিখেছে ভূপাল। আমাকে বাদ দিয়ে সে রেস্তোরাঁ চালাতে পারে কখনও ?

আইলীনের হাত ধ'রে রতন বললো, তাহ'লে আমি পিটারের সঙ্গে দেখা ক'রে এই রেস্তোরাঁ বিক্রি করবার বন্দোবস্ত করি ?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি বলছিলাম কি —

কি ?

যদি তুমি আমি কোনো রকমে কিস্তিতে টাকা দিয়ে কিনেনি — যদি আমরা দু'জন এটা চালাই —

আবার খিল্ খিল্ ক'রে হাসলো আইলীন, তুমি সত্যি বড়ো বোকা রটন্। ভূপাল রইলো ইণ্ডিয়ায় আর আমি এখানে থাকবো কেমন ক'রে ? তুমি তাড়াতাড়ি পিটারের সঙ্গে কথা বলো। মনে মনে হিসেব ক'রে আইলীন বললো, এটা তো ফেব্রুয়ারী মাস, ভূপালের ভাগ্নে এসে পড়বে মার্চে। সময় বড়ো কম। কোনদিন আমাদের চ'লে যেতে হয় কে জানে !

আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বললো না রতন।

১৩

তুষার থেমে গেছে। তবু ভারী ঠাণ্ডা এখন লণ্ডনে। থম থম করে চারপাশ। কঙ্কালের মতো নেড়া গাছগুলি দিশাহারা করে রতনকে। শুধু এলোমেলো বাতাসের একটানা হাহাশ্বাস। রতনের আজকাল নিজেকে মনে হয় নিঃসঙ্গ, এই বিদেশে যেন একেবারে একা সে। বারবার তার মনে হয়, সে বিদেশী। এমন কথা আগে কোনদিনও মনে হয় নি রতনের।

তুষারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে একা ফেলে চ'লে গেছে তার সোনা বউ। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করে না রতন। আবার সে আসবে, আবার বাজবে তার পায়ের মল, আর আকাশ থেকে আবার ক্ষণে ক্ষণে ঝ'রে পড়বে ভিজে শেফালীর দল। সোনা বউকে মনের নিবিড়ে চিরদিন ধ'রে রাখবে রতন।

কিন্তু আর কাউকে তো ধ'রে রাখতে পারবে না সে। যারা এতোদিন ছিলো তার কাছে কাছে, যারা সুখে-দুঃখে কতোবার ভুলিয়েছে তার প্রবাসের ব্যথা — একে একে তারা সকলেই চ'লে যাবে একদিন। দীনবন্ধু যাবে, ক্ল্যারা যাবে, চৌধুরী চ'লে গেছে।

চৌধুরীর কথা মনে হ'তেই শিউরে ওঠে রতন। অমনি ক'রে যদি সেও একদিন চ'লে যায়! ভাবতে ভাবতে সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে যায় রতনের। ভূপাল অমন চিঠি না লিখলে এতো বিচলিত হ'তো না সে। স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি রতন যে এমনি ক'রে হঠাৎ লণ্ডনের ব্যবসা তুলে দেবে ভূপাল।

আইলীনও চ'লে যাবে একদিন! তাকে বড়ো মায়া লাগে রতনের আজকাল। ছোটো মেয়ের মতো অবুঝ আইলীন। কেমন ক'রে রতন তাকে বোঝাবে আজ, যে আর কোনোদিনও ভূপাল তাকে এক লাইনও

চিঠি লিখবে না — তার নামও করবে না কারুর কাছে। দেশে গিয়ে নিজের পরিবারের পাশে ব'সে কে আর মনে রাখে বিদেশের খেলার কথা! তার সোনা বউকে পেলে রতনও কি মনে রাখবে আর কারুর কথা! এসব তো স্বপ্ন হ'য়ে যাবে একদিন — ধূলি হ'য়ে যাবে।

প্রথম থেকেই রতন জানতো ভূপাল এমনি ক'রে ফাঁকি দেবে আইলীনকে। কিন্তু এতো শীগগির — একবারও মনে হয় নি। মাঝখানে সব গোলমাল হ'য়ে গিয়েছিলো রতনের। বিষ্টু বিয়ে ক'রে সমূলে উপড়ে দিলো তার ধারণা। পুড়ে মরলো দুর্গা। তখন আরও একটা মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলো রতন — ভূপালের স্ত্রীর। বিষ্টু যেমন বিয়ে ক'রেছে ক্ল্যারাকে ঠিক তেমনি ক'রেই এই বয়সে ভূপাল বিয়ে করবে আইলীনকে। সে খবর না দিলেও তার সতী স্ত্রী স্বপ্নে পাবে সে-সংবাদ আর নিজেকে জ্বালিয়ে দেবে কেরাসীনে। তাই অনেকদিন আইলীনের ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'য়ে ছিলো রতন। বিয়ে হয়েছে জেনেও আবার সে ভূপালকে এমন ক'রে ভালোবাসবার অবসর দিলো কেন, কেন দিলো তাকে উৎসাহ? রতন তো ছিলো পাশেই, তার ডাকে সে সাড়া দেয়নি কেন, আজও দেয় না কেন!

কিন্তু ভূপাল ছোটোলোক নয় বিষ্টুর মতো। ভদ্রলোকের ছেলে সে, আর নিজেও ভদ্রলোক। লেখাপড়াও জানে কিছু কিছু। ভারী মাথা ঠাণ্ডা তার। সব দিক বুঝে কাজ করতে হয় তাকে। এখানে এসেছিলো সে ব্যবসা করতে, টাকা করতে, বিয়ে করতে নয়। লেখাপড়া জানে ব'লে বোধহয় শেষ অবধি সেকথা মনে ছিলো তার। টাকা করলো, সাধ মিটলো, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দেশের লোক দেশে ফিরলো। আবার বিয়ে করলো না, কাউকে পুড়িয়ে মারলো না। সাবাস ভূপাল!

কিন্তু পর-মুহূর্তেই বিষ্টুকে ভূপালের চেয়ে অনেক ভালো লাগে রতনের। তার স্ত্রী পুড়ে শেষ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আইলীনকে যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে ভূপাল। এই যদি ঠিক করেছিলো তাহ'লে লেখাপড়া শিখে, ভদ্রলোকের

ছেলে হ'য়ে, এমনি ক'রে একটা মেয়েকে ছলনা করলো কেন সে? আইলীনের মুখের দিকে তাকিয়ে ভূপালকে মনে মনে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে রতনের। আর বিষ্টুকে তার মনে হয় বাহাদুর। ক্ল্যারাকে খুব ভালো লাগে — আইলীনের চেয়েও। আজ বার বার সে এদের সকলকে তুলনা ক'রে দেখে মনে মনে। সব জেনে শুনেও আইলীন ভালোবেসেছে ভূপালকে। কিন্তু ক্ল্যারা তো জানতো না যে বিষ্টুর বিয়ে হয়েছে। তাই ক্ল্যারাকে আইলীনের চেয়ে বড়ো মনে হয়। বিষ্টু তাকে ঠকিয়েছে বটে কিন্তু ভূপালের মতো পালায়নি। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে নিজের স্ত্রীর কাছে ভূপাল যেমন ফিরে গেল, বিষ্টুও তো ঠিক তেমনি ক'রেই চ'লে যেতে পারতো। আইলীনের দুঃখের কথা আজ ভাবতে পারে না রতন, আর ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টুকে তার আগেকার মতোই ভালো লাগে। এতোদিন পর সে বিষ্টুকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করতে পারলো। আর ভাবলো ক্ল্যারার কাছে আর একবার ভালো ক'রে ক্ষমা চাইবে। সে যদি এবারও ক্ষমা না করে তাহ'লে লজ্জার সীমা থাকবে না রতনের।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হু হু ক'রে ওঠে তার মন। কাকে নিয়ে থাকবে লণ্ডনে! এতো বিচলিত সে হ'তো না, যদি না তাকে ইণ্ডিয়া গ্রীল বিক্রি করার বন্দোবস্ত করতে হ'তো। আবার নতুন জায়গায় তাকে চাকরী খুঁজতে হবে — নতুন লোকের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। আর নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে চায় না রতন — অনেক হয়েছে। আর কোন দোকানের মালিক ভূপালের মতো এতোখানি বিশ্বাস করবে তাকে? কথায় কথায় বাধবে ঝগড়া। নতুন ক'রে চাকরী খোঁজার উৎসাহও নেই তার। শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিছু ভালো লাগে না আজকাল।

বিষ্টু চ'লে যাবার পর ও বাড়ীটা ছেড়ে দেবে রতন। অতো বড়ো বাড়ীর আর দরকার কি? অল্ডগেটেই আর একটা ছোটো ঘর নিয়ে

থাকবে সে। হয়তো শুধু দীনবন্ধু লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। কিন্তু ক্ল্যারা চ'লে গেলে দীনবন্ধুর সঙ্গে আর একদিনও থাকবে না রতন। তাকে অমনি ক'রে টাকা ধার না দিলে এতোদিনে কতো টাকা জমিয়ে ফেলতে পারতো সে। এ বাড়ীতে আর ভালো ক'রে ঘুম হয় না রতনের। কে যেন তার কানের কাছে সারারাত ফুলে ফুলে কাঁদে। চৌধুরীর গলার স্বর চিনতে ভুল হয় না তার। তবু আজও ও-ঘরটা বদলাতে পারেনি সে। অন্তত একটা লোকও যদি তার কান্না না শোনে তাহ'লে কোনোদিনও সান্ত্বনা পাবে না চৌধুরীর আত্মা — চিরদিন অমনি কেঁদে কেঁদে ফিরবে। তাই শেষ অবধি ঘর বদলাতে পারেনি রতন।

সবাই যদি চ'লে যায় তাহ'লে কাকে নিয়ে থাকবে সে! এতো বড়ো বাড়ী আর কিছুতেই রাখা সম্ভব হবে না। অথচ অন্য কোথাও গিয়ে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে রতনের। শুধু যদি ক্ল্যারা আর বিষ্টু ওর সঙ্গে চিরদিন থাকতো এদেশে! তবে কি রতন চিরকালের জন্যে থেকে যাবে এখানে? আর ভাবতে পারে না ও। মাথার শিরাগুলো দপ দপ করে, একটা অদ্ভুত আশঙ্কায় ওর সমস্ত শরীর বারবার হিম হ'য়ে যায়। কিন্তু কিসের আশঙ্কা সেকথা নিজেই জানে না রতন। শুধু যদি ভূপাল মত বদলায় — শুধু যদি সে আবার ফিরে আসে — তাহ'লে হয়তো বেঁচে যায় রতন। চিরদিন এদেশে থাকতে হবে মনে করলে থেকে থেকে ভয় করে ওর। কি দরকার ছিলো জাহাজে চাকরী নেবার? কি দরকার ছিলো এদেশে আসবার? এখন থাকতেও পারবে না, ফিরতেও পারবে না। ঘুম হয় না রতনের। ছটফট করে সারা রাত।

কিন্তু সে-ই বা ফিরতে পারবে না কেন? আর একবার নিজের কথা ভালো ক'রে আরম্ভ করে রতন। ফিরতেই হবে তাকে। যদি দেশে গিয়ে খেতে না পায় তাহ'লে আবার চ'লে আসবে লণ্ডনে। কিন্তু দেশে গিয়ে উঠবে কোথায় — খাবে কি? টাকা কোথায়? চেষ্টা করলে বিষ্টুর মতো একটা চাকরী তার কি কিছুতেই হবে না? কালই সে ভূপালকে একটা চিঠি

লিখবে, কলকাতায় দোকানে সে নিশ্চয়ই চাকরী দেবে তাকে। ভাবনায় শরীর টলে রতনের।

একরকম আইলীনের তাগাদায় এর মধ্যেই রতন দেখা করেছে সেই ইটালিয়ান পিটারের সঙ্গে। দেরী সইছে না একদিনও আইলীনের। শীগগিরই এসে পৌছবে ভূপালের ভায়ে সুবোধ। নামটা একবার শুনেই মনে রেখেছে আইলীন। লেস্টার স্কোয়ারের অমন তৈরী রেস্তোরাঁ এখন কিনতে পাওয়া লণ্ডনের যে-কোন ব্যবসাদারের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তবু গরজ দেখে পিটার দাম দিলো এবার দেড় হাজার পাউণ্ড। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি আইলীন। কাজেই নিজে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এসে পিটার দু'হাজার পাউণ্ড দাম দেবে ব'লে গেছে। কিন্তু সুবোধ না আসা অবধি বিক্রি হবে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে পিটারকে। এ ক'দিন এরাই চালাবে রেস্তোরাঁ। আর সপ্তাহে সপ্তাহে এয়ার মেলে হিসেব পাঠাবে ভূপালকে। এই ইণ্ডিয়া গ্রীলও উঠে যাবে একদিন। দেরী নেই তার আর। কোথায় যাবে রতন!

লাস্ট টিউবের ভয় আর রতনের নেই। বারোটা বাজবার আগেই তাড়াহুড়ো ক'রে বেরোয় না সে। সবাই চ'লে গেলে আস্তে আস্তে রাস্তায় নামে। ভূপালের সেই ঘরে আইলীন একাই থাকে আজকাল। তাকে গুড নাইট জানিয়ে মাঝ রাত্তিরে মাঝে মাঝে পিকাডিলির চারপাশে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় রতন। প্রত্যেকটা দোকান বন্ধ। কিন্তু পিকাডিলি যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। রাতের পিকাডিলির চেহারা একেবারে অন্যরকম। লোকের মুখের বাঁধন খুলে গেছে এখন — কোলাহল জেগেছে। ঠোঁটে আর গালে রঙ মেখে এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মেয়ে। রতনকে তারা ইসারা করে, মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, হাত বাড়িয়ে 'হ্যালো' বলে। কিন্তু সে দেখে না তাদের দিকে। মুখ বুজে শুধু ঘুরে বেড়ায়। রিজেণ্ট স্ট্রীট ধরে কিছু দূর এগিয়ে যায়, হে মার্কেটে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ

তোলে, পলমল্ ছাড়িয়ে সেণ্টজেমস্ স্কোয়ারের কাছে এসে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। তারপর ইরসের মূর্তির তলায় এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মূর্তির ওপর। ইরসের হাতে ধনুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু তীর খুঁজে পায় না রতন। তীর কোথায় গেল ইরসের। এই রাত্তিরে সেই কোলাহল-মুখর লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডে দাঁড়িয়ে বিচ্ছেদের একটা করুণ সুর ক্ষণে ক্ষণে তার কানে বাজে। অথচ কেন এই বেদনা সেকথা সে জানে না। ইরসের মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভয় পায় সে। তার প্রতি রোমকূপ কেঁপে ওঠে।

সাফটস্‌বেরী এভিনিউ ধ'রে তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করে সে। কিন্তু ক্লান্তি সহজে আসে না আজকাল তার। সারা রাত সে এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিতে পারে। এতো রাত্তিরে কেমন ক'রে বাড়ী ফিরবে সেকথা ভাবে না রতন। যদি বাস্ পায় তো উঠে পড়বে। না হ'লে হেঁটেই ফিরবে। টিউব বন্ধ হ'য়ে গেছে প্রায় আধঘণ্টা আগে।

একটা বাস হাত দিয়ে থামিয়ে উঠে পড়ে রতন। বেশী কেউ নেই, শুধু দু'টো বুড়ী আর একটা বুড়ো ব'সে ব'সে ঢুলছে। হবোর্ণ অবধি যাবে সে-বাস। হবোর্ণ টিউব স্টেশন আসতেই কণ্ডাক্টার জানায়, এখানেই নামতে হবে সকলকে। বাস গ্যারেজে যাবে এবার।

প্রায় চোখ বন্ধ ক'রে চ্যান্সারী লেন ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করে রতন। ডানদিকের একটা গলি দিয়ে এসে পড়ে ফ্লীট স্ট্রীটে, তারপর বাঁ দিকে এগিয়ে যায়। অল্ডগেটে পৌঁছতে বেশ সময় লাগে তার।

কিন্তু তবুও ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না রতনের। এমনি হেঁটে হেঁটে বাকি রাতটুকুও কাটিয়ে দিতে চায়। আলি সাহেবের বাড়ীর সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আলি সাহেব, তার স্ত্রী আর টিপু সুলতান — এদের কথা বারবার মনে পড়ে আজ। কেন মনে পড়ে? তাদের যেন হিংসে হয় রতনের। এখানে প্রথম আসার পর সেও

তো অমনি সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলো। হঠাৎ তার আবার নতুন ক'রে মেম বিয়ে করবার সাধ হয়। হয় তো তা'হলে কেটে যাবে এই গ্লানি, মুছে যাবে এই বেদনা, দেশের কথা ভেবে বুক ঠেলে ঝরবে না দীর্ঘশ্বাস। ইণ্ডিয়া গ্রীল উঠে গেলেও আবার নতুন ক'রে চাকরী খোঁজার উৎসাহ পাবে সে।

হঠাৎ চমকে ওঠে রতন। আলি সাহেবের বাড়ীর পাশে অমন হাঁ করে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। আস্তে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে পুলিশ বলে যে, যদি রতন দয়া ক'রে তার আইডেনটিটি কার্ড দেখায় তাহ'লে বাধিত হবে সে। টর্চ জেলে সেটা দেখে সন্দেহ দূর হয় পুলিশের। তখন সে রতনকে দেয় উপদেশ, এমন করে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে নিউমোনিয়া ধ'রে যাবে তার। ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করে রতন। সেই পুলিশ শেষ অবধি তাকিয়ে থাকে তার দিকে, লক্ষ্য রাখে কোন বাড়ীতে ঢোকে সে।

ঘরে ঢুকতেই সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন ক'রে উঠলো রতনের। তার খাটে দীনবন্ধু শুয়ে আছে আর বমি ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছে মেঝে। মদের গন্ধে ঘর ভ'রে গেছে। ভয়ঙ্কর রাগে জ্বলে উঠলো রতন। কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে দূরে ছুঁড়ে ফেললো ওভারকোট। তারপর দীনবন্ধুর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, ব্লাডি সোয়াইন্ বাসটার্ড। দীনবন্ধুর দুই কাঁধ ধরে সে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকানি দিতে লাগলো।

কে বাবা? ইউর ফাদার বাসটার্ড, চোখ খুলে রতনকে দেখে দীনবন্ধু বললো, এই রাত্তিরে কোথা থেকে কি টেনে এলি রে? বলি দাপট দেখানো হচ্ছে?

তখনও দীনবন্ধুকে সমানে ঝাঁকানি দিতে দিতে রতন ব'লে চ'লেছে, এখুনি তোমাকে বমি পরিষ্কার করতে হবে —

তোর বাপের চাকর আমি? এক ধাক্কায় দীনবন্ধু রতনকে অনেক দূরে ঠেলে দিলো। কিন্তু রতন আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না। দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো।

আমার ঘরে কেন এসেছো তুমি?

চোখ পিটপিট ক'রে দীনবন্ধু বললো, ভালো ক'রে জিজ্ঞেস কর, উত্তর দিচ্ছি। অতো চোটপাট কিসের রে? বলি তুই জোরে আমার সঙ্গে পারবি রে?

ক্ল্যারা বাড়ীতে, এমন ক'রে মদ খেয়ে বমি করতে লজ্জা করে না তোমার?

শালা আমাকে আদব-কায়দা শেখাচ্ছে রে। বলি কে কোথায় আছো গো শোনো! এখানে কে মদ না খায় আর কে বমি না করে? বলি তুই কি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নাকি?

গোলমাল শুনে ক্ল্যারার ঘুম ভেঙে গেল। ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলো সে। দরজা খুললো রতন।

কি ব্যাপার? একি, বমি করেছো নাকি রতন?

আমি মদ খেয়ে কখনও বমি করি না। কিন্তু ও যদি এখুনি বমি পরিষ্কার না ক'রে তা'হলে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো আমি।

ও বাবা, এতো রাগ তোমার! আমি ভেতরে আসতে পারি কি?

এসো ক্ল্যারা, দীনবন্ধু নালিশ জানালো, দেখো, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমার ঘুম ভাঙিয়ে রতন বলে কিনা এখুনি ঘর পরিষ্কার করতে হবে।

আমি এ ঘরে ঘুমোতে পারবো না। সারাদিন খেটে খুটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী আসি —

রতনের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল ক্ল্যারা। মিনিট কয়েক পড়ে একটা ঝাঁটা আর অনেক খবরের কাগজ নিয়ে ফিরে এসে বললো, সরো সরো, গোলমাল করতে হবে না তোমাদের। নিজেই সে লেগে গেল দীনবন্ধুর বমি পরিষ্কার করতে।

কি করছো ক্ল্যারা, তাকে বাধা দিয়ে রতন বললো, তোমাকে তো পরিষ্কার করতে বলি নি আমি।

কিছু যায় আসে না, ক্ল্যারা হেসে বললো, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো গোলমাল করে কেউ? আমি ভাবলাম আগুন লেগেছে বুঝি বাড়ীতে।

রতন ডাকলো, দীনবন্ধু? কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। সে বোধ হয় তখন নাক ডাকিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

সরো ক্ল্যারা, আমি পরিষ্কার করবো।

কোন দরকার নেই, হয়ে গেছে প্রায়। এই রাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তো আমার! রতনের দিকে তাকিয়ে ক্ল্যারা বললো, মাতালদের আমার খুব ভালো লাগে, জানো রতন?

তাই নাকি? তুমি মাতাল হও ক্ল্যারা?

না, আমি মদ খাই না।

তাইতো ক্ল্যারাকে এতো ভালো লাগে রতনের।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর পরিষ্কার হ'য়ে গেল। কিন্তু তখনও দীনবন্ধুর ওপর রাগ যায়নি রতনের। এতো ঘর থাকতে লোকটা আজ ওর ঘরেই বা এসেছে কেন কে জানে।

নাও সব ঠিক, দীনবন্ধুর দিকে তাকিয়ে ক্ল্যারা বললো, ওকে আর জাগিও না যেন, মাতাল হয়েছে বেচারা — তুমি চৌধুরীর খাটে শান্ত ছেলের মতো শুয়ে পড়ো এবার।

না, ও খাটে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারবো না।

কেন?

ভয় করবে আমার।

ক্ল্যারা হাসলো, তুমি একটি ছোট্ট ছেলে। তবে যাও দীনবন্ধুর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। এমন করে রাত্তির জাগলে কাল কাজে যাবে কেমন ক'রে? দেখছো না ভোর হ'য়ে এলো —

ক্ল্যারা চ'লে এলো নিজের ঘরে। রতন তার ঘরে দরজা বন্ধ করবার শব্দ পেলো। কিন্তু ঘুম নেই রতনের চোখে। কয়েক মিনিট সেই ঘরে ঠিক তেমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর এসে ধাক্কা দিলো ক্ল্যারার ঘরে।

কে ?

আমি রতন।

দরজা খুলে ক্ল্যারা বললো, আমাকে কি একটুও ঘুমোতে দেবে না তোমরা আজ ?

না, অনেক তো ঘুমিয়েছো, হাসতে হাসতে ক্ল্যারার ঘরে ঢুকে রতন বললো, আমি গল্প করতে এলাম তোমার সঙ্গে।

কিন্তু আমি দুঃখিত, এটা গল্প করবার সময় নয় রটন্।

ঘুম পায়নি আমার একটুও।

আমার কিন্তু খুব ঘুম পেয়েছে, খাটের ওপর ব'সে ক্ল্যারা ছোটো হাই তুললো।

তাহ'লে ঘুমোও তুমি, রতন হঠাৎ ধপ ক'রে তার পাশে ব'সে প'ড়ে পকেট থেকে সিগ্রেট বের ক'রে বললো, একটা সিগ্রেট খাও।

আমি সিগ্রেট খাই না।

ও, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ একটা খাও।

না ধন্যবাদ।

ক্ল্যারার ঘরে ছাইদান নেই। রতন এদিক-ওদিক তাকিয়ে যখন ভাবছে কোথায় ছাই ফেলবে, তখন ক্ল্যারা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে একটা খালি সিগ্রেটের টিন এনে তার সামনে রাখলো। কিন্তু ঠিক তেমনি ক'রেই আবার এসে বসলো তার পাশে।

একটা সুখবর আছে রতন।

সুখবর ? কি সুখবর ক্ল্যারা ?

আর সাত আট দিনের মধ্যেই বিট্টু এসে পড়বে যে।

বিষ্টু? সাত-আটদিনের মধ্যে? কেমন ক'রে জানলে তুমি?

চিঠি লিখেছে আমাকে।

ক্ল্যারা রসিকতা করছে মনে ক'রে রতন হেসে বললো, দেখি চিঠি?

ক্ল্যারা উঠে ড্রয়ার খুলে চিঠি বের ক'রে রতনের হাতে দিয়ে বললো, দেখো।

বিষ্টুর হাতের লেখা রতন চেনে। চিঠি দেখেই টনটন ক'রে উঠলো তার বুক। বললো, কি লিখেছে? ইংরেজীতে লিখেছে নাকি?

হ্যাঁ, ক্ল্যারা হেসে বললো, তুমি বল বিষ্টু ইংরেজী লিখতে জানে না — পড় না এই চিঠিটা।

পড়বো?

রতন সত্যি চিঠি খুলে পড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার বেশীর ভাগই দুর্বোধ্য ঠেকলো তার কাছে। এমন ইংরেজী বিষ্টু লিখলো কেমন ক'রে? মেম বিয়ে করলে লোকে রাতারাতি ইংরেজী শিখে যায় নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলো রতন। জাহাজে কোনো ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে বিষ্টু চিঠিটা লিখিয়েছে। তারপর ধ'রে ধ'রে নিজের হাতে লিখে সেটা পাঠিয়েছে ক্ল্যারার কাছে।

হুঁ? চিঠিটা ক্ল্যারাকে ফিরিয়ে দিয়ে রতন বললো, সত্যি তাহ'লে এতো তাড়াতাড়ি বিষ্টু আসছে!

সে যে চিঠির অনেক অংশ বুঝতে পারেনি সেকথা তাকে বলতে আজ বড়ো লজ্জা হ'লো রতনের। একবার ইচ্ছে হ'লো বিষ্টুর বাহাদুরীর কথাটা ভেঙে দেয় ক্ল্যারার কাছে। কিন্তু তাও পারলো না শেষ অবধি। হাত দিয়ে কপালে উড়ে আসা চুল সরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে তোমার ভালো লাগছে না রটন্?

অন্যমনস্ক হ'য়ে রতন উত্তর দিলো, না।

স্বাভাবিক, ক্ল্যারা বেশ গম্ভীর হ'য়ে বললো, আমি চ'লে গেলে তোমাদের অসুবিধার কথাটা ভাবছো, না?

অসুবিধার কথা নয়, তুমি চ'লে যাবে তাই ভাবছি।

খুব জোরে হেসে ক্ল্যারা বললো, এতো দরদ!

ক্ল্যারা, একটু ইতস্তত ক'রে রতন বললো, তোমার সঙ্গে আমার আগে দেখা হ'লো না কেন?

একথা বলছো কেন?

তাহ'লে, হঠাৎ ক্ল্যারাকে কাছে টেনে নিয়ে রতন বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম।

রটন্! নিজকে মুক্ত করে দিয়ে ক্ল্যারা বললো, কি বলছো তুমি? তুমিও কি মদ খেয়ে এসেছো নাকি?

না।

তাহ'লে এসব কথা আমাকে বলবার মানে কি?

আজ রাত্তিরে আমার সাহস বড়ো বেশী বেড়ে গেছে ক্ল্যারা।

কিন্তু বিষ্টুর আগে যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'তো তাহ'লে যে আমি তোমাকে বিয়ে করতাম সেকথাই বা তুমি ভাবতে পারো কেমন ক'রে?

ক্ল্যারা, এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি? রতন আবার কাছে টেনে নিলো তাকে, তোমাকে ছেড়ে সত্যি আমি থাকতে পারবো না —

তাকে ঠেলা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে ক্ল্যারা শুধু বললো, রটন্! এই রাত্তিরে কেউ কোথাও নেই, শুধু তুমি আর আমি।— আবার ক্ল্যারার কাছে এগিয়ে এলো রতন।

রটন্, আমি ইংরেজ —

তা'তে কি ক্ল্যারা?

পুড়ে মরতে পারি না, কিন্তু স্বামীর বিশ্বাস রাখতে জানি।

ক্ল্যারা তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।

হ্যাঁ, দরকার হ'লে হ'তে পারি বৈকি।

ক্ল্যারা আর কোনো কথা বললো না। রতনও চুপ হ'য়ে গেল তার কথা শুনে। তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

তোমার কোনো ভয় নেই ক্ল্যারা।

ভয়! আমি কাউকে ভয় করি না।

আমাকে আজ তোমার ভয় করছে না?

দাঁতে দাঁত চেপে ক্ল্যারা শুধু বললো, আই হেট্ ইউ রটন্।

এরপর রতন আর কিছু বলতে পারলো না, একেবারে চুপ ক'রে রইলো। টেবিলের ওপর ক্ল্যারার ঘড়িতে দেখলো ভোর চারটে বেজেছে। আস্তে আস্তে বালিশে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো। আর ক্ল্যারার খাটে শুয়ে আজ ভোর রাত্তিরে বার বার তার মনে হ'লো, যখন দিশাহারা ক্ষুধার্ত মন নিয়ে সমস্ত লণ্ডন চ'ষে বেড়িয়েছে তখন এমন একটি মেয়ের সঙ্গে কেন তার দেখা হ'লো না।

রতনকে তার খাটে শুয়ে পড়তে দেখে ক্ল্যারা কোন কথা বললো না, কিন্তু নিজে উঠে গিয়ে বসলো সামনের চেয়ারে। তখনও বোধহয় রাগ যায়নি তার তাই কথা বলবার প্রবৃত্তি ছিলো না। তবু পাছে রতন তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, ভয় হ'লো ক্ল্যারার।

রটন্? প্রথমে আস্তে ডাকলো সে, রটন্? তারপর আরও জোরে, রটন্ —

কোন উত্তর নেই। খুব সাবধানে আবার সে এসে বসলো খাটে। ঘুমিয়ে পড়েছে রতন। তিনটে কম্বল তার গায়ে একসঙ্গে চাপা দিলো ক্ল্যারা। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আর সত্যি রতনকে তার মনে হ'লো ছোট্ট একটি ছেলে। মুখ নামিয়ে সে প্রায় তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলে। সভয়ে তাকিয়ে দেখলো চারপাশ — না কেউ দেখছে না তাকে। তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবলো ক্ল্যারা। তারপর আলো নিবিয়ে ড্রেসিং গাউন গায়ে সেই চেয়ারে ব'সে রইলো সারা রাত।

পরের দিনও বাড়ী ফিরে রতন দেখলো ঠিক তেমনি ক'রে দীনবন্ধু তার বিছানায় ব'সে আছে। কিন্তু আজ রতন আসতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে।

রোজ রোজ আমার ঘরে কি চাও তুমি ?

রাগ পড়লো রে রতনা ? আরে আমরা দু'টো এখানকার পুরোনো পাপী, শালা আমরা কামড়া-কামড়ি করলে চলে রে ?

এই কথাটা এতো রাত্তিরে না বললে কি চলতো না ?

দিনের বেলা তোর দেখা পাবো কোথায় রে ? তুই শালা তো রাতের মানুষ। শোন্, এবার একটা ঘর-টর দেখে নে তুই !

ঘর ?

হ্যাঁ রে শালা ঘর। বলি বিশ্বাস তো করবি না আমাকে — কিন্তু সব ঠিক ক'রে ফেললাম রে এবার। শালা আর দশদিন পর এতোক্ষণে আমি সে — অ্যামেরিকার জাহাজে।

সত্যি তুমি এই বয়সে অ্যামেরিকা যাচ্ছো দীনদা ?

হ্যাঁ রে শালা। বয়স আবার কি রে ? বলি বিলেতে পঁয়তাল্লিশ বছর আবার একটা বয়স নাকি রে ? আর যাচ্ছি, বুঝলি রতনা, গবর্ণমেন্টের পয়সায়। শালা সেখানেও মেসেঞ্জার। এ আপিস থেকে ধর-পাকড় ক'রে বদলী নিলাম। সেখানে গিয়েই ব্যবসা ফাঁদবো। শালার এদেশে কি কিছু হয় রে !

না, সত্যি এদেশে কিছু হয় না দীনদা।

আরে এই খবর পেয়ে কাল একটু বেসামাল হ'য়ে পড়েছিলাম। তোকে বলবো ব'লে তোর খাটে এসে শুয়েছিলাম — তা' তুই শালা এসে তো দড়াম দড়াম পিটতে সুরু করলি।

আমি জানতাম না তুমি এতো তাড়াতাড়ি চ'লে যাবে।

যাবো না তো কি, এখানে চৌধুরীর মতো মরবো রে ? সে-অ্যামেরিকার

থেকে শালার টাকার বস্তা নিয়ে হাতীতে চ'ড়ে গুটি গুটি একসময় দেশে ফিরবো। আসার সময় বউকে কথা দিয়ে এসেছিলাম অনেক টাকা নিয়ে আসবো — তাই তো বউ আসতে দিলে। আর, রতনের পিঠ চাপড়ে দীনবন্ধু বললো, বুঝলি রে রতনা, শালার মেয়ের বাজার সে-অ্যামেরিকা —

রতন জানে দীনবন্ধু অ্যামেরিকায় গিয়ে কি করবে। লণ্ডনে যেমন ক'রে কাটিয়ে গেল সেখানেও ঠিক তেমনি ক'রেই কাটাবে। তারপর হয়তো একদিন চৌধুরীর মতো শেষ হ'য়ে যাবে। তবু শেষ অবধি আশা রাখবে দীনবন্ধু, ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা সে করবেই — তারপর একদিন খুশী মতো দেশে ফিরবে।

তাই বলছিলাম যে রতনা, উঠে দাঁড়িয়ে দীনবন্ধু বললো, একটা ঘর-টর দেখে নে। ক্লারা বিষ্টু চ'লে গেলে —

এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে দীনদা ?

বলি এতো বড়ো বাড়ী নিয়ে কি বাপের বিয়ে দিবি রে ? হাই তুলতে তুলতে দীনবন্ধু নিজের ঘরে চ'লে গেল।

দীনবন্ধুও চ'লে যাবে অবশেষে। দেখতে দেখতে শূন্য হ'য়ে যাবে এ বাড়ী। বিষ্টু এসে পড়লো ব'লে। ক্লারাকে নিয়ে সে দেশে ফিরে যাবে। এই লণ্ডনে কে আর কার পথ চেয়ে ব'সে থাকবে ?

তবু এ বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে জমা কত মানুষের কতো স্মৃতি, চৌধুরীর কতো বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস, তার নিজের কতো হাসি-কান্নার ইতিহাস!

এ বাড়ী কেমন ক'রে ছেড়ে যাবে রতন।

১৪

দীনবন্ধু অ্যামেরিকা যাবার দিন তিন-চার পর মাল-পত্র নিয়ে বিষ্টু এসে হাজির হ'লো। এতো আগে তার ইংল্যাণ্ডে আসবার কথা ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ একটা যোগাযোগ হ'য়ে গেল। অন্য নতুন জাহাজে সে বদলী হ'লো। সে-জাহাজ আসছিলো ইংল্যাণ্ডে।

রবিবার দুপুর বেলা বিষ্টু এসে পৌঁছলো অল্ডগেটে। সঙ্গে এবার তার আর কেউ নেই শুধু দু'টো বড়ো বড়ো স্যুটকেশ। রতন বাড়ীতে ছিলো, ঘণ্টা শুনে নিচে গিয়ে বিষ্টুকে সাহায্য করলো ট্যাক্সি থেকে বাক্স নামাতে। ওরা দু'জনে ধরাধরি ক'রে সেগুলো নিয়ে এলো দোতালায়।

ক্লারার ঘরে ধাক্কা মেরে রতন বললো, শীগগির বাইরে এসো, কে এসেছে দেখে যাও। ক্লারা বাইরে এসে বিষ্টুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তারপর তাকে জড়িয়ে ধ'রে উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো, হ্যালো ডার্লিং!

হেলো হেলো, বিষ্টু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো?

খুব ভালো — তুমি?

তাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে রতন সরে গেল। ক্লারা বিষ্টুকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। চারদিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল বিষ্টু। ঝকঝকে তকতকে ঘর। ময়লা নেই, দুর্গন্ধ নেই কোথাও, এতটুকু গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। লোকগুলো গেল কোথায়!

আজ ক্লারার সামনে বিষ্টু যেন বেশ লজ্জা পেলো। তার মনে হ'লো

যেন এইমাত্র তাদের বিয়ে হয়েছে। ক্ল্যারার শরীর আরও ভালো হয়েছে — আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে সে। সেই কথাই ভাবছিলো বিট্টু। এই বউ নিয়ে সে যখন বোম্বাইএর রাস্তায় বেরোবে তখন লোকগুলো অবাক হ'য়ে দেখবে তার দিকে। কিন্তু তবু ক্ল্যারার কাছে সব সময় বিট্টু অস্বস্তি বোধ করে। জাহাজে-জাহাজেই বেশী থাকতে হয়েছে তাকে, ইংরেজী বলবার দরকার বড়ো একটা হয়নি তার। তাই আজও ইংরেজী বলতে বিট্টুর বেধে যায়। ক্ল্যারা কি বলে না বলে তার আদ্ধেক কথা বুঝতে পারে না সে, আর নিজে অনেক কথা বলতে চাইলেও প্রকাশ করতে পারে না — যা' বলতে চায় তার কিছুই বলা হয় না। তাই ক্ল্যারার কাছে নিজেকে বড়ো নিচু মনে হয় তার। ক্ল্যারা যখন তাকে উচ্ছ্বাস ভরা কথা বলে তখন তার এক বর্ণও না বুঝে বিট্টু শুধু হাসে। উত্তরে কি বলতে হবে ভেবে পায় না। আজ প্রথমেই ক্ল্যারা জিজ্ঞেস করলো, অতো ভালো ইংরেজী লিখতে পারো যখন, তখন কেন আমাকে আরও বেশী চিঠি লেখনি?

এর উত্তরে বিট্টু বলতে চেয়েছিলো যে জাহাজে চিঠি লেখবার সময় সে বেশী পায়নি। সব সময় ক্ল্যারার কথা তার মনে পড়েছিলো কিন্তু তাকে ছোটো চিঠি লিখতে তার ইচ্ছে করেনি আর বড়ো চিঠি লেখবার সময় পায়নি। তাই লিখবো লিখবো ক'রেও শেষ অবধি আর লেখা হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু এতো কথা ইংরেজীতে বলতে গিয়ে বিট্টু কি যে বললো নিজেই বুঝতে পারলো না। ক্ল্যারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এই রকম প্রত্যেকবারই হয়। তাই ক্ল্যারার কাছে সব সময় আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকে বিট্টু। ক্ল্যারাও তার কথা ভালো বুঝতে পারে না। তবু দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে। ক্ল্যারা তবু নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে দেয় বিট্টুকে। কিন্তু তাকে কিছু বলতে না পেরে অশান্তিতে বিট্টুর বুক ভ'রে যায়। ক্ল্যারা যদি বাঙলা জানতো তাহ'লে বিট্টু তাকে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারতো যে সে তাকে কতো ভালোবাসে।

বোধহয় বিষ্টুর মনের কথা বুঝতে পেরে ক্ল্যারা বললো, তোমাদের ভাষা শিখতে কতোদিন সময় লাগে?

' একথা শুনে আরও লজ্জা পেলো বিষ্টু। তার মনে হ'লো ক্ল্যারার কাছে সে যেন ধরা প'ড়ে গেছে। থেমে থেমে সে বললো, আচ্ছা ভালো। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একথা বিষ্টু কেন বললো তা' না বুঝে ক্ল্যারা তার ঘাড়ে মাথা দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

বিষ্টু ভাবছিলো অন্য কথা। সে ভাবছিলো দেশে নিয়ে গিয়ে ক্ল্যারাকে রাখবে কোথায়? তার দেশ যদি ক্ল্যারার ভালো না লাগে। বিষ্টুকে হাতে খেতে দেখে সে হয় তো হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবে। মাটিতে ব'সে তার স্ত্রী খাবে কেমন করে? গরমে সে যখন খালি গায়ে হাঁসফাঁস করবে তখন কি ভাববে ক্ল্যারা? এখানে তবু ততো ভাবনা হয় না বিষ্টুর। ক্ল্যারা ভাবে বিষ্টু বিদেশী তাই ইংরেজী না জানা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে গিয়ে সে যখন দেখবে অনেকেই বিষ্টুর চেয়ে ভালো ইংরেজী বলে তখন তার কি ধারণা হবে স্বামীর ওপর। কোনো ভালো হোটেলে স্ত্রীকে নিয়ে সে যেতে পারবে না। গরমে শীতের দেশে বেড়াতে যাবার কথাও ভাবতে পারবে না। ক্ল্যারার হাত ধ'রে তাকে রাস্তায় বেড়াতে দেখলে হাসাহাসি করবে সকলে। সেই দারিদ্র্যের মধ্যে ক্ল্যারাকে নিয়ে গিয়ে কি লাভ! অন্য লোকের সামনে সে যখন স্ত্রীর সঙ্গে ভুল ইংরেজীতে কথা বলবে তখন লজ্জার সীমা থাকবে না তার। দেশের অনেকেই মেম বিয়ে করতে চায়। হয়তো কোনো লেখাপড়া জানা লোকের দেখা পেয়ে ক্ল্যারা তাকে একদিন ছেড়ে যাবে। তখন বন্ধু-বান্ধবের সামনে বিষ্টু মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? দেশে গিয়ে ক্ল্যারা তাকে কতো ছোটো ক'রে দেখবে সেকথা ভেবে মন-মরা হ'য়ে বিষ্টু ব'সে রইলো স্ত্রীর পাশে। প্রাণ-খুলে কথা বলতে পারলো না। এতো তাড়াতাড়ি দেশে চাকরী নেয়া উচিত হয়নি তার। তার চেয়ে এদেশে থেকে গেলেই পারতো। রতনের মতো

একটা চাকরী সে অনায়াসেই পেতে পারতো। দেশের যে বন্ধু-বান্ধবরা এদেশে আসেনি তাদের সঙ্গে আর মিশতে পারবে না বিষ্টু। মেম বউ নিয়ে কাকে দেখাবে সে! কে কথা বলতে পারবে ক্ল্যারার সঙ্গে! তখন অসহিষ্ণু হ'য়ে ক্ল্যারাই খুঁজে নেবে সঙ্গী, আর ছেড়ে যাবে বিষ্টুকে। চাকরী নিয়ে কিংবা ব্যবসার বন্দোবস্ত ক'রে এদেশে থেকে গেলেই সব চেয়ে ভালো হ'তো। মাঝে না হয় ক্ল্যারাকে কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতো। সেই শীতেও বিষ্টুর হঠাৎ যেন গরম মনে হ'লো। এ বিষয় ভালো ক'রে আজই রতনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ক্ল্যারা বাঙালী হ'লো না কেন! যখন দূরে থাকে তখন মেম বিয়ে করেছে ব'লে গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে, সারাদিন ভাবে স্ত্রীর কথা। নিজের বাহাদুরীর কথা মনে ক'রে নিজেকেই নিজে বাহবা দেয়। বন্ধু-বান্ধবকে বলে ক্ল্যারার কতো গল্প। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এলেই ঝিমিয়ে যায় সে, মনে হয় তা'রা যেন হাজার যোজন দূরের মানুষ। পৃথিবীর সব মানুষের ভাষা এক হ'লো না কেন! কতো কথা যে বিষ্টু ব'লতে চায় ক্ল্যারাকে কিন্তু ভাষার প্রাচীর পদে পদে বাধা দেয়।

চুপ ক'রে আছো কেন? এতোদিন পর আমাকে দেখে তুমি খুশী হওনি?

হেঁ হেঁ আমি খুব খুশী হয়েছি —

তবে চুপ ক'রে আছো কেন?

কিছু ভাবছি।

কি ভাবছো?

মাথা চুলকে বিষ্টু বললো, আমাদের দেশ তোমার ভালো লাগবে না।

আমি জানি আমার খুব ভালো লাগবে।

কিন্তু বড়ো গরম সেখানে। আমি গরীব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি না। ক্ল্যারা, তুমি আমাকে ইংরেজী শেখাবে?

এই কথা ভাবছো তুমি? ক্ল্যারা হেসে বললো, গরম আমার খুব ভালো

লাগে। আর আমিও গরীব। কিন্তু ইংরেজী আমি তোমাকে শেখাবো না। তোমার দেশে যাচ্ছি তাই আমি তোমার ভাষা শিখে নেবো।

সত্যি ?

আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না।

কিন্তু আমাদের দেশে যদি থাকতে না পারো ?

কেন পারবো না ?

হেঁ হেঁ মানে —

তুমি থাকতে পারলে আমি পারবো না কেন ?

ক্লারাকে কাছে টেনে নিয়ে বিষ্টু বললো, তোমাকে কতো ভালোবাসি, কতো কথা বলতে চাই কিন্তু আমি ইংরেজীতে কিছু বলতে পারি না ক্লারা —

বেশ বলতে পারো। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি।

বিষ্টু আর কিছু বলতে পারলো না। অনেকক্ষণ ক্লারাকে জড়িয়ে ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর এক সময় উঠে আর সকলের খবর নিতে গেল রতনের ঘরে।

রতনের মুখে সবই শুনলো বিষ্টু একে একে। দীনবন্ধু চ'লে গেছে, চৌধুরী নেই আর। এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাবার চেষ্টা করছে রতন। পারলে হয়তো এ বাড়ী সে রাখতো কিন্তু অতো পয়সা নেই তার।

তুই কি বরাবর এখানে থেকে যাবি রতন ?

এখনও ঠিক করি নাই কিছু।

এবার একটা বিয়া কর, যা রোজগার করিস তা'তে এদেশে থাকলে সুখে চ'লে যাবে দু'জনের।

ক্লারার মতো একটা মেয়ে দেখে দাও না ?

বলি নাই তোরে আমি, খুশী হ'য়ে বিষ্টু বললো, যে অমন ভালো মেয়ে তুই পাবি না কোথাও ?

সত্যি বিষ্টুদা, তোমার বউএর মতো ভালো মেয়ে আর দুনিয়ায় নাই।

ঠাট্টা করিস নাকি রে রতনা?

না বিষ্টুদা, বুকে হাত দিয়ে বলছি, তোমার ভাগ্য এতো ভালো যে আমার হিংসা হয়।

দেখলি দেখলি, বলিস তো সেকথা! আরে বিয়া কি আমি শুধু শুধু করলাম রে? দেশ চুঁড়ে ফেললেও অমন মেয়ে তুই পাবি না কোথাও।

কতোদিন থাকবে তোমরা?

দিন কুড়ি। বড়ো তাড়াতাড়ি আমার। জাহাজ থেকে নেমেই আপিস যেতে হবে।

এই অল্প সময়ে ক্লারার জন্যে জাহাজ পাবে কি?

বিষ্টু হেসে বললো, ওরে আমরা জাহাজের লোক, ওসবে কি আমাদের আটকায় রে? ক্যাপ্টেন সাহেব সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তোমরা চ'লে যাবে?

হ্যাঁ রে, তুইও চলনা আমাদের সঙ্গে।

রতন হেসে একটা সিগ্রেট ধরালো। বিষ্টুর কথার কোনো উত্তর দিলো না। শীগগির একটা ঘর খুঁজে না পেলে চলবে না তার। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ঘর পাওয়া খুব সহজ হবে না হয়তো। অনেক বিদেশী এসে জুটেছে এখন অল্ডগেটে। কোথায় যাবে রতন!

মার্চের শেষের দিকে গরম পড়লো বেশ। আজকাল রেস্তোর্যাঁর দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। খোলা না রাখলে গরম লাগে। তবু ওভার-কোট তুলে রাখেনি লণ্ডনের লোক — হাতে ঝুলিয়ে বেড়ায়। তারা জানে আবার যে-কোনো সময় কনকনে ঠাণ্ডা পড়তে পারে। এখন যদিও ঠাণ্ডা নেই কিন্তু হাওয়ার খুব জোর। এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তায় বেরোলেই মাথার চুলগুলি বিব্রত হ'য়ে পড়ে। তবু মার্চের শেষে গরম লণ্ডনে এতো

অস্বাভাবিক যে লোকে গবেষণা করে কেন এমন হ'লো হঠাৎ, আর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সেই গরম দিনগুলি আনন্দমুখর ক'রে তোলবার চেষ্টা করে।

এমনি একদিনে ইণ্ডিয়া গ্রীলে এসে উপস্থিত হ'লো ভূপালের ভাগ্নে সুবোধ। উঠেছে সে রাসেল্ স্কোয়ারের কোনো বোর্ডিং হাউস্এ। ভূপাল তাকে ঠিকানা দিয়ে ব'লে দিয়েছিলো, ও পাড়াতেই ছাত্রদের বাসা — সেখানেই থাকবি। আড্ডা-টাড্ডা দিবি না বেশী। একটু এদিক-ওদিক করলেই টাকা বন্ধ ক'রে দেবো আমি। যেদিন পৌঁছবি সেদিনই দেখা করবি রতনের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি হোটেল বিক্রি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিবি আমাকে — তা' না হ'লে তোকে টাকা পাঠানো মুস্কিল হবে আমার পক্ষে। আর ওই হোটেল বিক্রির টাকাতেই কলকাতায় রেস্তোরাঁ খুলবো আমি। কাজেই চটপট করবি — বুঝলি ?

সুবোধ ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলো যে সে বুঝেছে। ভূপাল রতনের নামে একটা লম্বা চিঠি দিয়ে দিয়েছিলো তার হাতে। সুবোধেরও বেশ উৎসাহ ছিলো গ্রীল্ বিক্রির ব্যাপারে। কেন না মামাকে সে ভালো ক'রেই চেনে, দুম্ ক'রে হঠাৎ টাকা বন্ধ ক'রে দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় একেবারে।

অবশ্য যেদিন সে পৌঁছেছিলো সেদিন রতনের সঙ্গে দেখা করবার কথা ভাবতেই পারেনি সুবোধ। দেখা করলো দিন দশ-বারো পরে। ইণ্ডিয়া গ্রীল খুঁজে পেতে খুব বেশী দেরী হ'লো না তার। ভারতীয় মাত্রেই তার মামার দোকানের নাম জানে। বিকেল বেলা সুবোধ এসে ইণ্ডিয়া গ্রীলে ঢুকলো। আইলীন কাউণ্টারে ব'সে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো। আর কোনো লোক নেই এখন রেস্তোরাঁয়। সুবোধ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। তাকে দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো রতন।

আপনিই কি রতন বাবু ?

হ্যাঁ হ্যাঁ — আপনি ?

আমার নাম সুবোধ, ভূপাল বাবুর ভাগ্নে।

তার নাম শুনেই হিসেব-নিকেশ মাথায় তুলে আইলীন ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়ালো, আমি দেখেই চিনেছি, একেবারে মামার মতো দেখতে —

কিন্তু রতন ভেবে পেলো না সুবোধকে কেমন ক'রে বললো আইলীন যে সে অবিকল ভূপালের মতো দেখতে। খাতির ক'রে এরা দু'জন তাকে বসতে বললো। তারপর চা আর নানারকম দিশি খাবার নিয়ে এলো তার সামনে। কিন্তু ভূপালের ভাগ্নে ছুঁলো না সেগুলো। বললো, এদেশে যতোদিন থাকবো ততোদিন দিশি খাবার খেতে মামা বারণ ক'রে দিয়েছে। তা'তে নাকি পয়সা বেশী খরচ হয় আর শরীরও ভালো থাকে না।

রতন ঠিক বুঝতে পারলোনা কেন তাকে ভূপাল বলেছে একথা। তবু সে বললো, এটা তার মামার দোকান, কাজেই এখানে খরচ লাগবে না কিছু, আর ওই মিষ্টি খেলে শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না সুবোধের।

তখন ভূপালের ভাগ্নে সুবোধ নিমেষে প্লেট খালি ক'রে দিয়ে বললো, আরও দিন। আইলীন ছুটে গিয়ে আরও সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে এলো তার জন্যে। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কখন সুবোধ তাকে ভূপালের খবর দেবে আর তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাকে নিয়ে যাবার দিন ঠিক করবে। কিন্তু এসেই সুবোধ কেমন ক'রে বলবে সেকথা! কাজের কথা শেষ হ'য়ে গেলে হয়তো তাকে আড়ালে ডেকে একে একে সব জানাবে। আইলীন সেই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিলো।

রতনের সঙ্গে কাজের কথা শেষ করতে দেরী হ'লো না ভূপালের ভাগ্নের। ভূপাল সমস্ত হিসেব ভালো ক'রে দেখতে বলেছে সুবোধকে, আর সম্ভব হ'লে সাত আটদিনের মধ্যে জীল বিক্রি ক'রে টাকা পাঠাতে বলেছে। রতনের চিঠি সে বের ক'রে দিলো। চিঠিতেও রতনকে সেই এক কথাই লিখেছে ভূপাল। হিসেব-পত্রের খাতা মন দিয়ে দেখতে লাগলো সুবোধ। রতন বললো, বিক্রির সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক ক'রে রেখেছি,

আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম সুবোধবাবু। আসবার আগে তো আপনি একটাও চিঠি দেননি আমাদের —

না, মামা বারণ করেছিলো, হঠাৎ এসে প'ড়ে হিসেবের খাতা দেখতে বলেছিলো আমাকে।

ও, হেসে রতন বললো, তা' কি দেখলেন, সব ঠিক আছে ?

ঠিকই তো মনে হচ্ছে। তবে মামা বলেছিলো যাই থাক না কেন বলবি খরচ একটু বেশী হচ্ছে।

রতন এবার হাসলো না। গম্ভীর হ'য়ে বললো, ও এই কথা বলেছেন !

এরা বাংলায় কথা বলছিলো। এক বর্ণ বুঝতে না পারলেও তাদের মুখ দেখে আইলীন প্রাণপণে কথার বিষয়-বস্তু ধরবার চেষ্টা করছিলো। আর, একবার সুবোধের মুখের দিকে একবার রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠছিলো।

খাতা থেকে মাথা তুলে সুবোধ বললো, তা' এবার তাহ'লে বিক্রির বন্দোবস্ত করুন। কতোদিন লাগবে ? দেরী হ'লে মামার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আমার।

বেশী দেরী হবে না। শীগগিরই চুকে যাবে বলে মনে হয়। পিটার তো হাঁ করে বসে আছে আপনার অপেক্ষায় —

বেশ। কবে তার সঙ্গে দেখা করবো বলুন ?

যেদিন আপনার খুশী। বলেন তো আজই ফোন করতে পারি ?

না না আজ নয়। মামা আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। সেটা কোথায় আছে জানি না, একটু খুঁজতে হবে। চিঠি না দেখালে আমাকে সে টাকা দেবে কেন ? বরং কাল সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করুন আমার।

বেশ, কাল সন্ধ্যেবেলা আসুন আপনি এখানে, আমি পিটারকে আসতে বলবো।

আচ্ছা, তাহ'লে এই ঠিক রইলো, উঠে দাঁড়িয়ে সুবোধ বললো, আজ আসি আমি।

নমস্কার ক'রে রতন বললো, আসুন।

সুবোধ বেরিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু আইলীন ছুটে এসে তার পথ আটকে চুপে চুপে বললো, আমার চিঠি কই ?

তোমার চিঠি ?

হ্যাঁ, ভূপাল কোনো চিঠি দেয়নি আমাকে ? আমার নাম আইলীন।

আইলীন, অবাক হ'য়ে সুবোধ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে ?

আমার নাম কখনও শোননি তুমি ?

না তো।

আমাকে বলবার জন্তে ভূপাল কোনো কথা বলেনি তোমাকে ?

না।

আচ্ছা তুমি যাও। সুবোধ বেরিয়ে যেতেই রতনকে বললো আইলীন, শোনো রটন্, এ কখনও ভূপালের ভায়ে নয়। ভূপালের ভায়ে আমার নাম শোনেনি এ কি হ'তে পারে ?

রতন হেসে বললো, চিয়ার্ আপ্ আইলীন — এমন কতো হয় !

কি বলছো তুমি ?

ভূপাল আর আসবে না, তোমার নামও করবে না কারুর কাছে কোনোদিন। আর যদি কখনও আসে তোমাকে চিনতেও পারবে না।

রটন্ তুমি বড়ো বাজে কথা বলো।

রতন হেসে জোরে আইলীনের পিঠ চাপড়ে আবার বললো, চিয়ার্ আপ্ আইলীন !

দিন কয়েকের মধ্যেই বেচা-কেনার ব্যাপার চুকে গেল। টাকা নিয়ে টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে সুবোধ পাঠিয়ে দিলো মামাকে।

তারপর এক লম্বা চিঠি লিখে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলো।

রতন আর একবার জিজ্ঞেস করেছিলো আইলীনকে, এখনও সময় আছে আইলীন, এসো তুমি আর আমি কিস্তিতে টাকা দিয়ে কিনেনি এ গ্রীল্?

ভূপাল নেই, তবু তুমি এ দোকানে আমাকে থাকতে বলো কেমন ক'রে?

কিন্তু সে তো আর আসবে না আইলীন।

মরা মানুষ হাসলে যেমন দেখায় তেমন ক'রে হেসে আইলীন বললো, যদি ও কোনোদিনও না আসে তাহ'লে একদিন আমাকেই যেতে হবে ওর কাছে। আমি এখন থেকে তাই টাকা জমিয়ে যাবো। তবে আমি জানি ভূপাল আমার কাছে একদিন ফিরে আসবেই — আমি শুধু তারই অপেক্ষা করবো।

এখন কি করবে তুমি?

ওয়েট্রেসের চাকরী আর করবো না। আপাতত মা বাবার কাছে আমাদের গ্রামে গিয়ে থাকবো কিছুদিন।

তারপর?

অতো কথা এখনও ভেবে দেখিনি রটন। হয়তো সাত সমুদ্র পার হ'য়ে যাবো তোমাদের দেশে। ভূপালের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হওয়া চাই-ই চাই।

রতনকে রাখতে চাইলো না পিটার। বললো, ইণ্ডিয়ান ওয়েটার আমার দরকার নেই, আমার স্ত্রী আর মেয়েরাই কাজ চালিয়ে নেবে। তবে আইলীন কাজ করতে চাইলে বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু আইলীন সে-অবসর দিলো না পিটারকে। ভূপালের স্মৃতি সম্বল ক'রে নিঃশব্দে একদিন লণ্ডন ছেড়ে চ'লে গেল তার মা বাবার কাছে ডেভনশায়ারে।

ইণ্ডিয়া গ্রীল নামটা রাখলো পিটার। সব যেমনকার তেমনি রইলো

চেয়ার টেবিল সরিয়ে ঘরের কোনো অদল-বদল করলো না সে। শুধু রতন হ'লো বেকার !

কিন্তু রতন ভাবে না তার জন্যে। কিছু টাকা জমিয়েছে সে — তাতেই চলবে কিছুদিন। তার এখন একটু বিশ্রামের দরকার। অনেক খেটেছে সে। অন্তত ক্ল্যারা আর বিষ্টু যে ক'দিন রয়েছে সে-ক'দিন একটু হৈ হৈ করা যাবে ওদের সঙ্গে। কি মনে ক'রে ইণ্ডিয়া গ্রীল বিক্রি হ'য়ে যাবার কথা তাদের বলতে পারলো না রতন। চাকরী নেই — একথা বলতে কোথায় যেন বেধে গেল তার। তাই বললো, তোমরা যে-ক'দিন আছো ছুটি নিয়েছি সে-ক'দিন।

কাজেই রতনের এখন প্রচুর অবসর। আর সময়টাও ভালো — রোদ্দুর ওঠে মাঝে মাঝে। বাড়ীতে এখন রান্না-বান্নার পাট তুলে দিয়েছে ওরা। বিষ্টু বলে, আবার কবে ফিরে আসবো ঠিক নাই, অনেক করেছিস তোরা আমার বউএর জন্যে, চল্ এ ক'টা দিন বাইরে খাই।

ক্ল্যারা বিষ্টু আর রতন ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারাদিন। টাওয়ার হিল্ টিউব স্টেশনে নেমে টাওয়ার অব্ লণ্ডনে গেল। সেখানে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে মণি-মুকুট বন্দুক-তলোয়ার দেখলো। মার্বল-আর্চে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে আইসক্রীম খেলো। পার্ক লেন ধ'রে ডর্‌চেস্টার হোটেলের পাশ দিয়ে এসে পড়লো গ্রীন পার্কের কাছে। পিকাডিলির দিকে রতন যেতে দিলে না ওদের — তার সব সময় ভয় পাছে ইণ্ডিয়া গ্রীলের কথা এরা জেনে ফেলে। ডান দিকে এগিয়ে গেল হাইড পার্ক কর্ণারের দিকে। সেন্ট জর্জেস্ হাসপাতালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে এসে বসলো হাইড পার্কের বেঞ্চে। মার্বল-আর্চ থেকে দু'নম্বর বাস্ ধ'রে রিজেন্টস্ পার্কে চিড়িয়াখানায় গেল। বাঘ-সিংহের ঘরে এসে ওদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো রতন। খাঁচার ওপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রতনকে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একে একে সব ক'টা বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করলো।

হেসে ক্ল্যারাকে বললো রতন, দেখো ক্ল্যারা, দেশের লোক দেখে ওরা আমাকে সেলাম জানাচ্ছে।

বন্দী বাঘ-সিংহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে রতন।

চলো, একসময় ক্ল্যারা তার হাত ধ'রে টানলো, আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকেও অমনি খাঁচায় ভ'রে চিড়িয়াখানার কর্তারা লিখে রাখবে, ফ্রম্ ইণ্ডিয়া।

তারপর রেস্তোরাঁয় সাপার খেয়ে ওরা ছবি দেখতে গেল। এমনি ক'রে সেই কয়েকটা উজ্জ্বল দিন অত্তো তাড়াতাড়ি কোথা দিয়ে কেটে গেল ওরা বুঝতেই পারলো না। যাবার দিন এসে গেল। অথচ আজও ঘর খোঁজা হ'লো না — ওরা চ'লে যাবার পর এ বাড়ীতে একদিনও কিছুতেই একা থাকতে পারবে না রতন। ওদের পৌঁছে দিতে যাবে সে। ওয়াটারলু স্টেশন অবধি নয় — একেবারে সাউদাম্প্‌টন বন্দর অবধি। জাহাজ থেকে যত্তোক্ষণ ওকে নামিয়ে না দেয় ততোক্ষণ 'ডেকে' দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করবে। জাহাজ ছাড়লে যত্তোক্ষণ দেখা যায় ততোক্ষণ তাদের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়বে সে। আস্তে আস্তে সমুদ্রের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে এক-সময় অদৃশ্য হ'য়ে যাবে সেই বিরাট জাহাজ। তখন রতন এ বাড়ীতে একা ফিরবে কেমন ক'রে!

যাবার আগের দিন বিট্টু ঘুমিয়ে পড়বার পর অনেক রাত্তিরে খুব আস্তে আস্তে রতনের দরজায় ধাক্কা দিলো ক্ল্যারা। বেশী রাত্তিরেও সহজে রতনের ঘুম আসে না কোনদিন — আজও আসেনি। ও জেগেই ছিলো। তবু শোনার ভুল ভেবে প্রথমে সাড়া দিলো না। আবার আর একটু জোরে শব্দ করলো ক্ল্যারা। আলো জেলে দরজা খুলে অবাক হ'য়ে রতন ক্ল্যারাকে দেখলো। গায়ে তার নীল ড্রেসিং গাউন।

কি ব্যাপার ক্ল্যারা ?

রতনের ঘরে ঢুকে চেয়ারে ব'সে ক্ল্যারা হেসে বললো, কাল চ'লে যাবো তাই আজ নির্জনে দেখা ক'রতে এলাম তোমার সঙ্গে।

অনেক ধন্যবাদ ক্ল্যারা। হয়তো এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

ওকথা ব'লো না রটন, আমার মন খুব খারাপ হ'য়ে যাবে তাহ'লে।

এতো দয়া ? হেসে রতন বললো, যাবার বেলায় আমাকে এতো দয়া দেখাচ্ছো কেন ক্ল্যারা ? কারুর কাছ থেকে দয়া পেতে আমি ভালোবাসি না যে।

ক্ল্যারা রতনের একটা হাত কোলের ওপর নিয়ে বললো, দয়া নয় রটন্ —

তবে ?

তুমি বোকা তাই — তাই দয়া ব'লে ভুল করো।

ক্ল্যারার কোলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রতন বললো, তবে কি প্রেম ? তুমি আমাকে ভালোবাসো নাকি ? হেসে সে তাকালো ক্ল্যারার দিকে।

সে-কথার উত্তর দিলো না ক্ল্যারা। মাথা নিচু ক'রে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

দেশ ছেড়ে যেতে তোমার খুব মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে ?

না, কিন্তু —

ব'লে যাও।

কিন্তু কেমন ক'রে সেকথা তোমাকে বলবো রটন্ ?

কি কথা ? কেন বলতে পারবে না ? বল ক্ল্যারা।

তোমাকে আমি ভয় করি রটন্।

ভয় ? খুব জোরে হেসে উঠে রতন বললো, কিন্তু ঠিক এমনি এক রাত্তিরে

যখন আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে, আমি কাউকে ভয় করি না, আই হেট্ ইউ — মনে পড়ে ক্ল্যারা ?

সে-রাত্তিরের কথা আমি কোনোদিনও ভুলবো না।

আমিও না। কিন্তু সে-রাত্তিরের কথা তুমি ভুলে যেও ক্ল্যারা। আর আমাকে মাপ ক'রো।

রটন্, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

কোথায় ?

ইণ্ডিয়ায়। বিট্টুর মতো একটা চাকরী তোমারও জুটে যাবে। এখানে যেমন ক'রে আমরা একসঙ্গে ছিলাম সেখানেও ঠিক তেমন ক'রে থাকবো।

আমি ভেবে দেখবো।

তোমাকে যেতেই হবে, ক্ল্যারা রতনের পাশে ব'সে তার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে মিনতি করলো।

এতোদিন আমাকে ডাকোনি কেন ক্ল্যারা ? কতোবার তোমাকে বলেছি একদিন আমার সঙ্গে বেড়াতে চলো কিন্তু বারবার তুমি আমাকে নিষ্ঠুরের মতো ফিরিয়ে দিয়েছো —

না রটন্, তুমি ভুল করেছো, তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

ভুল আগে করতাম কিন্তু আজকাল বোধহয় আর করি না।

হ্যাঁ আজও করো। — রটন্ তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

যাবার বেলায় আমাকে এমন ক'রে ডেকো না ক্ল্যারা। আমি যাবো না — যেতে পারবো না।

তুমি মূর্খ রটন, ক্ল্যারার গলা ভারী হ'য়ে উঠলো, কিছু বোঝো না, দয়া মায়া কিছু নেই তোমার।

হয় তো নেই।

তুমি জানো কেন আমি তোমাকে এতোদিন দূরে দূরে রেখেছি ? বার বার ফিরিয়ে দিয়েছি ?

না।

ভয়ে। আর একটু হ'লে সে-রাত্তিরে আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে বিষ্টুকে ফাঁকি দিতাম — তুমি আমাকে জয় ক'রে নিতে পারতে —

আশ্চর্য হ'য়ে ক্ল্যারার মুখের দিকে তাকিয়ে রতন বললো, এ তুমি কি বলছো ক্ল্যারা ?

ভয়ে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, দূরে দূরে রেখেছি সব সময়। সে-রাত্তিরে যখন তুমি বললে বিষ্টুর আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো না কেন — উঃ না, সেকথা আজ আমি বলতে পারবো না, আমি কিছু জানি না — রতনের কোলে মাথা রাখলো ক্ল্যারা।

নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে রতন। ক্ল্যারার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনেক পরে সে বললো, একথা আমাকে দু'দিন আগে বললে না কেন ক্ল্যারা ?

কেমন ক'রে বলবো ? বিষ্টুকে কেন ঠকাবো ? তাই সব সময় ভাণ করেছি তোমাকে যেন আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে-রাত্তিরে আর একটু হ'লে — নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আজ আমি ক্লান্ত রটন্, তাই এসেছি তোমার কাছে —

কেঁদো না ক্ল্যারা।

রটন্ তোমার সঙ্গে আমার বিষ্টুর আগে দেখা হ'লো না কেন !

ক্ল্যারা ?

কি ?

এখনও সময় আছে —

কিসের সময় ?

এক মিনিট কি ভেবে রতন বললো, বিষ্টুর সঙ্গে তুমি যেও না।

না না রটন্ ওকথা ব'লো না — আমাকে আরও দুর্বল ক'রে দিওনা —

ক্ল্যারা তুমি যেও না।

আমাকে যেতেই হবে।

আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

বিষ্টুকে ছাড়তে পারবো না আমি —

কিন্তু আমার কি হবে? কে দেখবে আমাকে?

তুমি চলো আমাদের সঙ্গে, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে।

হেসে ক্ল্যারার মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রতন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তুমি ঘরে যাও ক্ল্যারা। অনেকক্ষণ হ'লো, বিষ্টু জেগে উঠলে কি ভাববে?

তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না রটন্?

তোমরা যাও আগে, গুছিয়ে বসো, তারপর আমি যাবো বৈকি একদিন।

প্রতিজ্ঞা করো?

আবার হেসে রতন বললো, করলাম।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো ক্ল্যারা। তারপর একসময় রতনকে শুভ নাইট জানিয়ে নিজের ঘরে গেল। বিষ্টু অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন।

রতনের কিন্তু আর ঘুম এলো না সে-রাত্তিরে। সারারাত জেগে শুধু একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে যেতে লাগলো সে। আর ভোরের আলো ঘরে এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে নেমে এলো ঘুম।

পরদিন হঠাৎ রতনের খেয়াল হ'লো, যাবার আগে ক্ল্যারাকে একটা ভালো উপহার দিতে হবে। বেচারী অনেক করেছে তাদের জন্যে। কিন্তু কি কিনবে ভেবে পেলো না। ঠিক করলো বাইরে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে একটা পছন্দ মতো জিনিস কিনে নেবে। ড্রয়ার থেকে চাবি বের ক'রে ট্রাঙ্ক খুললো সে। ব্যাঙ্কে কখনও টাকা রাখে না রতন। আগে ব্যাঙ্কে যাবার সময় ছিলো না তার। টাকা রাখে সে ট্রাঙ্কে, কাপড়ের তলায়। সে ভাবলো আজ একবার গুনে দেখবে কতো টাকা জমেছে তার।

কিন্তু যেখানে সে টাকা রাখে একটি নোটও নেই সেখানে। বাক্স তোলপাড় ক'রে তুললো রতন — কিন্তু কোথায় টাকা!

বেশীক্ষণ ভাববার সময় নেই। ঘণ্টা কয়েক পরে চ'লে যাবে ক্ল্যারা আর বিট্টু। এখুনি বেরিয়ে পড়তে না পারলে কিছুই কেনা হবে না ক্ল্যারার জন্যে। তার পকেটে যা সামান্য টাকা আছে অগত্যা তাই দিয়েই কিনতে হবে উপহার। পরে না হয় ভালো ক'রে হারানো টাকার খোঁজ করলে চলবে। কাউকে কিছু না ব'লে নিচে নেমে এলো রতন।

রাস্তায় বেরোবার দরজার কাছে এসে সে দেখলো একটা চিঠি প'ড়ে আছে। ফাঁক দিয়ে সকালবেলা যথারীতি ফেলে গেছে পোস্টম্যান্। চিঠিটা তুলে নিলো রতন। খোকাবাবু লিখেছে দীনবন্ধুকে। পরের চিঠি খোলে না রতন। তাই সেটা পকেটে রেখে ভাবলো, যদি কোনোদিন দীনবন্ধু ঠিকানা দিয়ে চিঠি লেখে তাহ'লে এটা পাঠিয়ে দেবে তার কাছে।

হঠাৎ রতনের মনে পড়লো দীনবন্ধুর কথা। সে এখন কতোদূরে কে জানে!

১৫

অগতির গতি আলি সাহেব। এদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'লে মাঝে মাঝে দুঃখ ক'রে বলে আলি যে ঠেকায় না পড়লে কেউ নাকি তার কাছে আসে না। আজও হাসতে হাসতে রতনকে সেই কথাই বললো সে। কোথাও তার থাকবার একখানি ঘর না পেয়ে রতন অবশেষে শরণ নিলো আলি সাহেবের।

তাই তো বলি হঠাৎ এতো সৌভাগ্য আমার হবে কেন!

ছি ছি আলিসাহেব, ওকথা বলবেন না। রোজ মনে করি আপনার কাছে আসবো কিন্তু আপনি তো বাড়ীতেই থাকেন না।

থাক্ ভাই ওসব কথা। কিন্তু বাড়ীতে যখন থাকি তখন? রাস্তা দিয়ে তো হন হন ক'রে হেঁটে যাওয়া হয় দেখি?

ঘরের জন্যে মাথা খারাপ হবার জোগাড়, সকাল থেকে রাত্তির অবধি ছুটোছুটি ক'রে নিরাশ হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি আলি সাহেব।

এ বুদ্ধিটা আগে মাথায় আসলো না কেন? বলি আমি কি ম'রে গেছি?

জিব কেটে রতন বললো, আরে ছি ছি কি যে বলেন! আপনি না থাকলে আমরা বাঁচবো কেমন ক'রে?

থাক্ ভাই, মুখে বড়ো ভালোবাসা, কিন্তু —

এইবার দেখুন আলিসাহেব, এসে উঠি আপনার বাড়ীতে, তখন দেখবেন কতো ভালোবাসি আপনাকে।

বেশ বেশ, ঘর যখন আছে আমার, তোমাদের কাজে লাগলে আমি

খুশী হবো। হেসে আলিসাহেব বললো, তবে একটা কথা, ছোরা-টোরা নেই তো তোমার ?

অবাক হ'য়ে রতন বললো, ছোরা !

হাসতে হাসতে সে গণেশের গল্প বললো রতনকে। তার কথা আজও ভোলেনি আলিসাহেব।

সাতদিনের নোটীসে অল্ডগেটের বুড়ো বাড়ী ছেড়ে দিয়ে রতন এসে উঠলো আলিসাহেবের ঘরে। দু'টো ঘরই তাকে দিতে চেয়েছিলো আলি-সাহেব। ভেবেছিলো রতন শীগগিরই বিয়ে করবে ব'লে তার ঘর ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু রতন জানালো আপাতত তার বিয়ের কোনো আশাই নেই। একটাতেই তার কাজ চ'লে যাবে। শুধু শুধু দু'টো ঘর আটকে রেখে আলিসাহেবের অসুবিধা বাড়াতে চায় না সে। আর রান্না — রান্নার হ্যাঙ্গাম সে করতে চায় না, যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহ'লে খাওয়া-দাওয়া তাদের সঙ্গে করতে পারলে খুশী হবে রতন।

সেকথা শুনে আলিসাহেব অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো, সে কি তোমার হোটেল কি হ'লো ?

এবার আর রতন চেপে রাখতে পারলো না, ফস্ ক'রে ব'লে ফেললো, বিক্রি হ'য়ে গেছে, আমার চাকরী নেই এখন।

হুঁ, তাহ'লে কি করবে, চাকরী হবার আশা আছে কোথাও ?

এখনও খোঁজ করি নাই, বিশ্রাম করতে চাই কিছুদিন।

বেশ বেশ, কোনো ভাবনা ক'রো না ভাই। যতো দিন বেঁচে আছি — কথা শেষ না ক'রে আলিসাহেব হাসতে লাগলো।

এদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল রতনের। এইবার একেবারে নিশ্চিন্ত হ'লো সে। আর কোনো ভাবনা নেই তার। সময় মতো আস্তে আস্তে একটা চাকরী খুঁজে নিলেই চলবে। কিন্তু সারাদিন রেস্তোরাঁয় বন্ধ হ'য়ে থাকবার ইচ্ছে আর নেই তার। শুধু রাস্তায় ঘুরে

থাকতে চায় সে। লণ্ডনে তেমন চাকরী কি কেউ দেবে না তাকে? কিন্তু সে-ভাবনা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না রতন।

হ্যালো আঙ্কল্।

কি টিপু সুলতান?

সবাই চ'লে গেল, তুমি যাবে না?

টিপু সুলতানকে কোলে তুলে নিয়ে রতন বললো, আমি চ'লে গেলে তোমাকে এমনি ক'রে কোলে তুলে নেবে কে? এমনি ক'রে আদর করবে কে?

সত্যি তুমি চিরকাল এখানে থাকবে?

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি টিপু সুলতান?

আণ্টি এনো না কিন্তু আঙ্কল্। এক আণ্টি তোমার ঘরে ছিলো, সে আমাকে মারতো, চকলেট দিতোনা তোমার মতো।

তোমার ভয় নেই টিপু। আমি কখ্খনো আণ্টি আনবো না। আসতে চাইলে ঘরে ঢুকতে দেবো না। আরও কতো চকলেট দেবো তোমাকে। চলো, বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

দাঁড়াও মা'কে ব'লে আসি, মা'র কাছে ছুটে চ'লে যায় টিপু সুলতান।

একটু পরে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রতনের সামনে এনে আলি সাহেবের স্ত্রী বলে, কোথায় নিয়ে যাবে একে? বড়ো দুষ্টু ছেলে, সারাক্ষণ বিরক্ত করবে তোমায়।

মা'র কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না আঙ্কল্। মা আমাকে একটুও ভালো বাসে না কি-না তাই অমন কথা বলে। আমি খুব ভালো ছেলে হ'য়ে তোমার সঙ্গে বেড়াবো।

তার হাত ধ'রে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ে রতন। আবার সে চিড়িয়াখানায় যায় আর চুপ ক'রে টিপুর সঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বাঘ-সিংহের খাঁচার সামনে। কিন্তু দেশের লোক ব'লে আজ আর

রতনকে চিনতে পারে না ওরা — তেমনি ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত অভিনন্দনও জানায় না। ওরাও যেন ঝিমিয়ে গেছে।

রাত্তির বেলা খাবার পর অনেকক্ষণ গল্প করে ওরা তিনজন। দেশের নানা আলোচনা হয়। দেশ থেকে নতুন কেউ এলে তাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে নানা খবর জিজ্ঞেস করে আলি সাহেব। আর মাঝে মাঝে ভারত-বর্ষের ম্যাপ্ খুলে টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে প'ড়ে রতনকে বলে, এই দেখো বেঙ্গল, ওই যে আসাম, আর এই তো দেখছো সিলেট। এইখানে আমার বাড়ী রতন —

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রতনের মনে হয় হাতের কাছে তার দেশ — নিমেষে সেখানে পৌঁছতে পারে সে।

দেশে যাওয়ার কিছু ঠিক করেছেন নাকি আলি সাহেব?

যাবো বৈকি, যাবো। এখন তো তুমি রইলে আর ভাবনা কি আমার। তবে ব্যবসা জ'মে উঠেছে এখানে, এই বয়সে দেশে গিয়ে নতুন ক'রে তো কিছু সুরু করতে পারবো না। খালি স্ত্রীকে তার শশুর বাড়ী ঘুরিয়ে আনতেই হবে একবার কিছুদিনের জন্যে —

কবে নিয়ে যাবে তুমি? ব্যস্ত হ'য়ে স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, এখন তো রটন্ আছে, কাজও নেই ওর কিছু, ও তোমার বাড়ী ব্যবসা দুই-ই দেখতে পারে?

ঠিক ঠিক। কিছু যদি মনে না করো রতন, একটা কথা বলি।

আপনার কথায় কিছু মনে করতে পারি আমি আলি সাহেব?

একটা বিশ্বাসী লোকের দরকার আমার, লণ্ডনের সব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মণি-মুক্তো বিক্রি করবার জন্যে। চেহারা ভালো তোমার আর ওয়েস্ট এণ্ডের রেস্তোরাঁয় কাজ করেছো তুমি — কতো লোককে চেনো।

খুব খুশী হ'য়ে রতন বললো, আমার বড়ো উপকার করবেন। অমন কাজ পেলে আমার ভাগ্য ব'লে মনে করবো।

সে তোমার যা —

হয় দেবেন, আপনার সঙ্গে দরাদরি নাই আমার।

মাইনে ছাড়া কমিশনও পাবে তুমি।

না পেলেও কোনো ক্ষতি নাই আলি সাহেব।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আলি সাহেব বলে, ব্যাস্ নিশ্চিন্ত, এইবার তোমাকে সত্যি তোমার শ্বশুর বাড়ী ঘুরিয়ে আনবো।

তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ রতন, এতোদিন বিয়ে হ'লো অথচ স্বামীর দেশ দেখলাম না এখনও।

আর রতন ভাবে অগতির গতি আলি সাহেব সত্যি গতি ক'রে দিলো তার।

আবার লণ্ডন চ'ষে বেড়ায় রতন। লিভারপুল স্ট্রীট থেকে সে যায় ইলিঙ্ ব্রডওয়ে, হাউন্স্‌লো থেকে কক্‌ফস্টার, স্ট্যানমোর্ থেকে এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেল্।

গ্রীষ্মকালে টিউবে চড়ে না রতন। বাস্ স্টপে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে বাস্ থামায়। তারপর দোতালায় উঠে ব'সে পড়ে। কোথায় যাবে জানে না। কণ্ডাক্টার এসে টিকিটের দাম চাইলে চোখ বুজে বলে, থ্রি হে পেন্স্ প্লিজ। কণ্ডাক্টার কি চেঞ্জ ফিরিয়ে দিলো তা' না দেখেই পকেটে ফেলে তোতাপাখির মতো বলে, থ্যাঙ্ক্ ইউ। অতো শাদা লোকের ভীড়ে একমাত্র ভারতীয় রতনের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখে, কিন্তু সে তাকায় না কোনো দিকে। মাথা নিচু ক'রে দেড় পেনি দামের খবরের কাগজে মন দেবার চেষ্টা করে। রোদ উঠলে নকল মণি-মুক্তোর বাক্স হাতে নিয়ে কোনো পার্কের বেঞ্চিতে গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকে সে। আজও মাঝে মাঝে মেয়ে এসে বসে তার

পাশে। তাড়াতাড়ি রতন দূরে স'রে যায়। কিছুক্ষণ পর আলাপ ক'রে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সিগ্রেট বের ক'রে মেয়েটি দেশলাই চায় তার কাছে। পকেটে দেশলাই থাকলেও ঘনিষ্ঠতা হবার ভয়ে রতন বলে, দুঃখিত, দেশলাই নেই আমার কাছে। একটু পরে আস্তে আস্তে উঠে যায় সেখান থেকে। কোনো কোনোদিন পিকাডিলির চারপাশে ঘুরে বেড়ালেও ইরসের মূর্তির দিকে মাথা তুলে আর তাকায় না সে।

শীতকালে তুষারের দিনে সম্ভব হ'লে বাড়ী থেকে বেরোয় না রতন। আর যদি একান্তই বেরোতে হয় তাহ'লে ওভার কোটের কলার ভালো ক'রে তুলে ছুটে গিয়ে টিউব ধরে। নিউমোনিয়ার বড়ো ভয় তার আজকাল।

আর তখন কি কেউ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় রতনের মনের নিবিড়ে? কালো রঙ্ তার, লম্বা লম্বা চুল, আঁটসাঁট দেহের বাঁধন আর টানা টানা চোখ — তার এতোদিনের সোনা বউ। তার কথা আর ভাবে না রতন।

তবু ফিসফিস রিমঝিম তুষার ঝরে।